দাওয়াতে তাবলীগ কি ও কেন?

হাফেজ মাওলানা মুফ্‌তী
হাবীব ছামদানী

মুহাম্মদীয়া কুতুবখানা
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।

সূচীপত্র

বিষয় ঃ | পৃষ্ঠা ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

ঈমানের পরিচয়

ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ বিশ্বাস বা আস্থা স্থাপন করা। এবং ইসলামী পরিভাষায় উহার অর্থ, মুখের স্বীকারোক্তিসহ আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁহার গুণাবলী সম্পর্কে অন্তরের সহিত বিশ্বাস স্থাপন করা এবং হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও আল্লাহ তাআ'লার তরফ হতে তাঁহার বান্দাগণের কাছে যাহা কিছু পৌছেছে, উহা সমস্তই সত্য ধারণা করতঃ বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তদনুযায়ী আমল করা। ইহাকেই সাধারণ অর্থে ঈমান বা সংক্ষিপ্ত ঈমান বলা হয়।

ঈমান সংক্রান্ত চল্লিশ হাদীস

সালমান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঐ চল্লিশটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যেগুলোর ব্যাপারে তিনি বলেছেন যে, কেউ এগুলো মুখস্থ করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এগুলো কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন : (১) আল্লাহ্র উপর ঈমান আনবে। (২) পরকালকে বিশ্বাস করবে। (৩) ফিরিশতাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। (৪) আল্লাহ্র কিতাবসমূহের উপর ঈমান রাখবে। (৫) সকল নবী ও রাসূলের উপর ঈমান রাখবে। (৬) মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর ঈমান রাখবে। (৭) ভাল ও মন্দ সবকিছু আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে হয়, এই তাকদীরের উপর বিশ্বাস রাখবে। (৮) আর এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র রাসূল। (৯) পরিপূর্ণ ওযূসহ সময়মত (ফরয) নামায আদায় করবে। (১০) যাকাত আদায় করবে। (১১) রমযানে রোযা রাখবে। (১২) মাল-সম্পদ থাকলে বায়তুল্লাহর হজ্ব করবে। (১৩) দিবা রাত্রিতে ১২ রাকআত সুন্নত নামায আদায় করবে। (১৪) কোন রাত্রেই বিতরের নামায ছাড়বে না। (১৫) আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকেই শরীক করবে না। (১৬) পিতা-মাতার অবাধ্যতা করবে না। (১৭) অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল গ্রাস করবে না। (১৮) শরাব পান করবে না। (১৯) ব্যভিচার

করবে না। (২০) আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা শপথ করবে না। (২১) মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না। (২২) প্রবৃত্তির অনুসরণে কোন কাজ করবে না। (২৩) আপন মুসলমান ভাইয়ের গীবত করবে না। (২৪) সতী নারীর প্রতি যিনার অপবাদ দিবে না। (২৫) আপন মুসলমান ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে না। (২৬) খেলাধূলায় লিপ্ত হবে না। (২৭) কৌতুক ও তামাশায় শরীক হবে না। (২৮) বামন ব্যক্তির দোষ প্রকাশের উদ্দেশ্যে তাকে হে বামন বলে ডাকবে না। (২৯) কোন মানুষের সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপ করবে না। (৩) দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একের কথা অপরের কাছে নিয়ে যাবে না। (৩১) আল্লাহ্‌র নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে। (৩২) বিপদ-মুসীবতের সময় ধৈর্যধারণ করবে। (৩৩) আল্লাহর আযাব থেকে নির্ভয় হয়ে থাকবে না। (৩৪) নিজের আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে না। (৩৫) তাদের সাথে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখবে। (৩৬) আল্লাহর কোন সৃষ্টজীবকে অভিশাপ দিবে না। (৩৭) বেশি করে সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করবে। (৩৮) জুমু'আ ও দুই ঈদের নামায পরিত্যাগ করবে না। (৩৯) জেনে রেখো, তোমার জীবনে (ভাল-মন্দ) যা কিছু এসেছে তা কখনও না আসার নয়। আর যা হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে তা কখনও ধরা দেবার নয়। (৪০) যে কোন অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত ছাড়বে না। (কানযুল উম্মাল)

উম্মতে মুহাম্মদীর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ.

"তোমরাই হলে শ্রেষ্ঠ উম্মত, তোমাদেরকে নির্বাচন করা হয়েছে মানব জাতির কল্যাণের জন্য, তোমরা সৎকাজের আদেশ দান করবে এবং অসৎ কাজে বাধা দান করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।" (আল-ইমরান)

উক্ত আয়াতে কারিমার দ্বারা একথাই স্পষ্ট হয়ে যায় যে উম্মতে মুহাম্মদীর শ্রেষ্ঠত্বের এক মাত্র কারণ হলো সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ। অর্থাৎ এ উম্মৎ নিজে সৎ কাজ করবে এবং অপরকে তা করতে উৎসাহিত করবে তবেই তারা শ্রেষ্ঠ।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– "উত্তম ঐ ব্যক্তি যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, আর নিকৃষ্ঠ ঐ ব্যক্তি যার দ্বারা অন্যরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।"

আল্লাহর পথে আহ্বানের তরীকা

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ -

"তোমার পরওয়ারদেগারের পথে মানুষকে সুন্দর কথা ও মোলায়েম ভাষায় ডাক এবং তাদের সাথে যুক্তির সাহায্যে আলোচনা কর"।

এই আয়াতে আল্লাহ্ পাক রাসূলুলাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দ্বীনের প্রতি আহ্বান করতে নির্দেশ করেছেন।

দাওয়াতের কাজের বিভিন্ন তরীকা

বর্তমান সমাজে পর্দাহীনতা, গান-বাজনা, ক্রীড়া-কৌতুক এবং শরীঅতের বিধি-বিধান পালন করা থেকে বিরত রাখার জন্যে এক শ্রেণীর মানুষ সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন।

এ সম্পর্কে নবী কমীম (সাঃ) ভবিষ্যদ্বানী করেন- এমন একটি যামানা আসবে যখন ধর্মের উপর অটল থাকা কষ্টকর হবে, যেরূপ জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হাতে রাখা কষ্টকর হয়। আর ঐ যামানা হচ্ছে, আমাদেরই যামানা যে যামানায় শরীয়াতের পূর্ণ অনুসরণকারীদেরকে বিভিন্ন প্রকারের অকথ্য ভাষায় ব্যবহার এবং শরীয়াতের বিধি-বিধানকে অশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা হয় যে পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামে শরীয়াত পরিপন্থী কার্যকলাপ বর্জন করতঃ সুষ্ঠ পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্যে নির্দেশ দিয়ে থাকে।

কাউকে কোন প্রকার অন্যায় করতে দেখলে

নবী করীম (সঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ رَاىٔ مِنْكُمْ مُنْكِرًا فَلْيغَيره بِيَدِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ - فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ - وَذَالِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ

অর্থাৎ-যখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কাউকে কোন অসৎকর্মে লিপ্ত দেখবে, তখন যেন তা স্বীয় হস্তে সংশোধন করে দেয়। যদি শক্তি না থাকে তাহলে যেন জিহ্বা দ্বারা সংশোধন করে দেয়। আর যদি তাও না থাকে তাহলে যেন (উক্ত ক্রিয়াকে) অন্তরের দ্বারা সংশোধন করে দেয়া আর এটাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা দূর্বল ঈমানের পরিচয়। (মেশকাত শরীফ)।

উক্ত হাদীস জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই যেন হিদায়াত এবং সংশোধান পুর্ণপন্থা প্রদর্শন করে এবং প্রতিটি শরীয়াত পরিপন্থী ক্রিয়ার সংশোধনীর জন্যে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বর্তমানে মানুষের হৃদয় থেকে গুনাহের অনিষ্টতা এবং ক্ষতির অনুভূতি বিলুপ্ত হতে চলছে। আর আল্লাহ পাকের মৌলিক নীতিসমুহের প্রতি আদৌ ভ্রূক্ষেপ করছেনা যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষদেরকে গুনাহ করার জন্যে এমনিভাবেই শিথিলতা দিয়ে থাকেন। তবে যখন আল্লাহপাকের অবাদ্যাচারণে সীমালংঘন করে এবং গুনাহকে তুচ্ছ মনে করা আর এমাতাবস্থায় অন্যায় ও পাপাচার ব্যাপক আকার ধারণা করে তখন অলসতা এবং অনুভূতিহীন হওয়ার দরুন আল্লহপাকের শাস্তি নির্ধারিত হয়ে যায়, যার ফলে বিভিন্ন প্রকারের বালা-মসীবত অবতীর্ন হতে থাকে।

দাওয়াতের কাজ না করলে মানুষ আল্লাহর আযাবে গ্রেফতার হবে

যেমন- হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) কর্তৃক বর্নিত, রাসুল (সাঃ) এরশাদ করেছেনঃ

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ تَقْرؤُنَ هٰذِهِ الْاٰيَةِ - يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اِهْتَدَيْتُمْ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ النَّاسَ اِذَا رَأَوْ مُنْكَرًا فَلَمْ يُغَيِّرُوْهُ يُوْشِكُ اَنْ يَعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابِهٖ -

হে দুনিয়ার মানুষ ! তোমরা আল্লাহপাকের এ আয়াত পাঠ করেছ?

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ -

অর্থঃ হে বিশ্বাসীগণ ! তোমরা দৃঢ়তার সাথে (আল্লহপাকের বিধি-বিধানকে) পালন কর তাহলে পথভ্রষ্ঠ লোকেরা তোমাদের কোনই ক্ষতি সাধন করতে পারবে না, যতক্ষন পর্যন্ত তোমরা হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কেননা আমি স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) থেকে শ্রবণ করেছি যে, তিনি এরশাদ করেছেন ঃ যখন লোকেরা কাউকে শরীয়াত পরিপন্থী কোন কর্মে লিপ্ত দেখবে আর এমতাবস্থায় তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে না তখন অনতিবিলম্বে তাদের উপর আল্লাহ পাকের শাস্তি নির্ধারিত হয়ে যাবে । (মেশকাত শরীফ ৪৩৬ পৃষ্ঠা)

ইব্রাহীম ও ইয়া'কুব (আঃ) স্বীয় পুত্রদেরকে তাবলীগ সম্পর্কে উপদেশ

وَوَصّٰى بِهَا اِبْرٰهِمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ - يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ - البقرة : ١٣٢

এবং ইব্রাহীম ও ইয়া'কুব এই সম্বন্ধে তাদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়েছেন, 'হে পুত্রগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দ্বীনকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং আত্মসমর্পণকারী না হয়ে তোমরা কখনো মৃত্যুবরণ কর না।"- বাকারা ঃ ১৩২

পরিপূর্ণভাবে দ্বীনে দাখিল হতে হবে

يَاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا ادْخُلُوا فِى السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ـ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ـ

হে মু'মিনগণ! তোমরা সর্বাত্মক ভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (বাকারা ঃ ২০৮)

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهُ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ـ ال عمران : ٨٣

তারা কি চায় আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন ? যখন আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সমস্তই স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তার নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। আর প্রতিই তারা প্রত্যান্বিত হবে। (ইমরান ঃ ৮৩)

দাওয়াতের কাজ সম্পর্কে আয়াত

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ـ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ـ النساء : ١٢٥

তার অপেক্ষা দ্বীনে কে উত্তম যে সৎকর্ম পরায়ণ হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে ? এবং আল্লাহ ইব্রাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। – নিসা ঃ ১২৫

قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰنِىْ رَبِّىْۤ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ـ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ الانعام : ١٦١

বল, আমার প্রতিপালক আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। তাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ। সে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। – আনয়াম ঃ ১৬১

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

الانعام : ١٦٢

বল, আমার ছালাত, আমার কোরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য । – আনয়াম ঃ ১৬২

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ـ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ـ لَاتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ـ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ـ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ ـ

الروم : ٣٠

তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর। সে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দ্বীন ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেনা। – রুম ঃ ৩০

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَاوَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ـ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَاتَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ـ اَللّٰهُ يَجْتَبِىْۤ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاۤءُ وَيَهْدِىْ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ـ الشورى : ١٣

তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে আর আমি অহী করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মুসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা কর এবং তাতে মতবিরোধ কর না। তুমি মুশরেকদেরকে যার প্রতি আহবান করছ তা তাদের নিকট দুরূহ মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং সে তার অভিমুখে তাকে দ্বীনের প্রতি পরিচালিত করেন। – শূরা ঃ ১৩

দ্বীনি দাওয়াতের কর্মীরা পরকালে সাক্ষী হবে

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ـ النحل : ٨٤

যে দিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে এক একজন স্বাক্ষী উত্থিত করব সে দিন কাফেরদেরকে অনুমতি দেয়া হবে না এবং তাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের অনুমতি দেয়া হবে না। – নাহল ঃ ৮৪

দ্বীনের পথে দলে দলে মানুষ কখন দাখিল হয়

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۔ نصر : ۲۔۱

যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এবং তুমি দলে দলে মানুষদেরকে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে। – নাছর ঃ ১ - ২

দ্বীন থেকে দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দানকারীর পরিণতি

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۔ فَالْيَوْمَ نَنْسٰهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا ۔ وَمَا كَانُوا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُونَ ۔

الاعراف : ٥١

যারা তাদের দ্বীনকে ক্রিড়া কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছিল এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রত্যারিত করেছিল। সুতরাং আজ আমি তাদেরকে বিস্মৃত হব যেভাবে তারা তাদের এই দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিল এবং যেভাবে তারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করেছিল। – আরাফ ঃ ৫১

দ্বীন হিসেবে ইসলামই আল্লাহর একমাত্র মনোনীত

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ : ال عمران : ١٩

ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন। যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা পরস্পর বিদ্বেষ বশতঃ তাদের নিকট জ্ঞান আসার পরও মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। আর কেউ আল্লাহর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের জানা উচিত আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর। – আল্ ইমরান ঃ ১৯

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۔ ال عمران : ٨٣

তারা কি চায়, আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন ? যখন আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সমস্তই স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। আর তাঁর প্রতিই তারা প্রত্যান্যিত হবে।– আল্ ইমরান ঃ ৮৩

দ্বীনকে তামাশার বস্তু মনে করা নিষেধ

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ۔ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۔ أُولٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ۔ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۔

যারা তাদের দ্বীনকে ক্রিড়া কৌতুকরূপে গ্রহণ করে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করে তুমি তাদের সংগ বর্জন কর এবং এটা দ্বারা তাদের উপদেশ দাও! যাতে কেউ নিজ কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয় যখন আল্লাহ ব্যতিত তার কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না এবং বিনিময় সবকিছু দিলেও তা গৃহীত হবে না। এরাই কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস হবে। কুফরীহেতু এদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। – আনয়াম ঃ ৭০

দাওয়াতী কাজে পুরুষ ও নারী পরস্পর সহায়ক

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ. (سورة توبة ٧١)

"আর ঈমানদার পুরুষ ও নারী পরস্পরের সহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশিত পথের অনুসরণ করে। এদেরই উপর আল্লাহ পাক দয়া করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী সুকৌশলী।"

মুনাফিক লোকেরা একে অপরের পরিপূরক। তারা যেমন পরস্পরের সহায়ক নয়, তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে সাহায্যকারী হলেও ভাল কাজে নয় বরং শুধু মন্দ ও অসৎকাজের ইন্ধন যোগায়। অপরদিকে মু'মিন নর-নরী একে অপরের সহযোগী। সৎ ও ন্যায়ের পথে, কল্যাণ ও সফলতার তরে, সালাত, যাকাত,

সিয়াম সহ খোদায়ী নির্দেশনার সকল ক্ষেত্রে আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে, চুরি, ডাকাতিতে নয়, হত্যা, গুম পাশবিকতায় নয়, নয় অনাকাংখিত জুলুম নির্যাতন ও প্রহসনের পথে সহযোগিতা, কেবল আল্লাহর রাসূলের পথেই তাদের সব ত্যাগ তিতিক্ষা-ভালবাসা ও সহযোগিতা একে অপরের স্বার্থে আত্মোৎসর্গের উন্মত্ততা। শুধুমাত্র পুরুষই সার্বিক ও সফলতা কল্যাণ ও মর্যাদার একক মাপকাঠি নয়, আর নারী কেবল অনুগ্রহের আজ্ঞাবহই নয়। বরং নর-নারী সকলেই সকলের তরে নিবেদিত। একে অপরের আশীর্বাদপুষ্ট হয়েই দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী সংসার চাকচিক্যময় করে গড়ে তোলে। আর জীবনের ধাপে ধাপে তারা পারস্পরিক দয়ামায়ার বহু প্রচলন ঘটিয়ে মানব সমাজে স্বস্তি, শান্তি, সমৃদ্ধির যোগান দেয়। ধরেত্রী হয় অনাবিল আনন্দোৎসবের প্রাণকেন্দ্র।

নেক্কার নারী পুরুষের প্রশংসা

إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْقَانِتَاتِ

الخ

"নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ ও নারী, মু'মিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনীত পুরুষ ও নারী, দানশীল নর-নারী রোযা সম্পাদনকারী নর-নারী, যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহর অধিক যিকিরকারী পুরুষ ও নারী। আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।"

নারী-পুরুষ যদিও কোরআন পাকের সাধারণ নির্দেশাবলীর আওতাধীন, কিন্তু সাধারণতঃ সম্বোধন করা হয়েছে পুরুষদের। আর নারী জাতি পরোক্ষভাবে এরই অন্তর্গত।

উত্তম কাজের প্রতিদান

সেদিন আপনি দেখবেন ঈমানদার পুরুষ ও নারীদেরকে, তাদের সম্মুখে ও ডানপার্শ্বে তাদের জ্যোতি ছুটোছুটি করবে। বলা হবে আজ তোমাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তাতে তারা চিরকাল থাকবে। এটা মহাসাফল্য। কিয়ামতের দিবসে নূরের প্রকাশ পুলসিরাতে চলার পূর্বক্ষণে ঘটবে।"

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে আল্লাহ নিয়ামত বাড়িয়ে দেন

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ–

"যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই বাড়িয়ে দিব। আর যদি তোমরা কুফরী কর (অকৃতজ্ঞ হও) তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি বড় কঠিন" (১৪ ঃ ইব্রাহিম ৭ নং আয়াত)।

মুমিনের বৈশিষ্ট্য

المومن। এর মূল ধাতু امن। এর শাব্দিক অর্থ যে বিশ্বাস করে, স্বীকৃতি দেয়, এর পারিভাষিক অর্থ আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপনকারী, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের একক সত্ত্বা, তাঁর প্রেরিত রাসূল, ফেরেশতা, কিতাব, পরকাল এবং তাকদীর এর ওপর আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপনকারীকে ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় মুমিন বলা হয়। মুমিনের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন -

প্রকৃত মুমিন তারাই, যারা আল্লাহ ও রাসূলের পথে আনার পর আর সন্দেহে পড়ে না এবং নিজেদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। এরাই (তাদের ঈমানের দাবিতে) সত্যবাদী। (হুজুরাত - ১৫)

প্রকৃত মুমিদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে- আল্লাহ্‌র স্মরণে তাদের দিল কেঁপে ওঠে, তাদের সামনে আল্লাহর বাণী উচ্চারিত হলে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, তারা আল্লাহর ওপর আস্থাশীল ও নির্ভরশীল হয়ে থাকে, নামায কায়েম করে এবং আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক থেকে ব্যয় করে। বস্তুতঃ এরাই হচ্ছে সত্যিকারের মুমিন। তাদের জন্য আল্লাহর নিকট খুবই উচ্চ মর্যাদা রয়েছে আরো রয়েছে অপরাধের ক্ষমা ও অতি উত্তম রিযিক। (আনফাল - ২ - ৪)

মুমিনদের বৈশিষ্ট্য, যখন তাদের মাঝে ফায়সালার জন্যে আল্লাহ ও রাসূলের (বিধানের) প্রতি ডাকা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। আর এরূপ লোকেরাই প্রকৃত সফলকাম। (নূর - ৫১)

মোমিনদের উচিত কম হাসা

আল্লাহপাক এরশাদ করেনঃ

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَّلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ –

" অতএব তারা সামান্য হেসে নিক এবং তারা তাদের কৃতকর্মের বদলাতে অনেক বেশী কাঁদবে। (সূরা তওবা, ৮২ আয়াত)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক মুনাফিকদের অবস্থার ধারাবাহিক বর্ণনার পর এরশাদ করেন যে, মুনাফিকদের আনন্দ ও হাসি অতি সাময়িক। এরপর আখেরাতে তাদেরকে চিরকাল কাঁদতে হবে। এ আয়াতের তফসীরে একটি হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে তফসীরে মাযহারীতেঃ

الدُّنْيَا قَلِيلٌ فَلْيَضْحَكُوا فِيهَا مَاشَاءُوا فَاِذَا انْقَطَعَتِ الدُّنْيَا

وَصَارُوا اِلَى اللهِ فَلْيَسْتَأْنِفُوا الْبُكَاءَ لَايَنْقَطِعُ اَبَدًا –

" দুনিয়া সামান্য কয়েক দিনের অবস্থান স্থল, এতে যত ইচ্ছা হেসে নাও। অত:পর দুনিয়া যখন শেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হবে, তখনই কান্নার পালা উপস্থিত হবে যা, আর নিবৃত্ত হবে না।"

মোটকথা, মুনাফিকদের হাসির প্রতি আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কারণ তাদের হাসি পরকাল থেকে গাফেল হওয়ার হাসি।

হযরত রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাসি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে কিভাবে হাসতে হয় এবং কতটুকু হাসতে হয়। আর কিভাবে হাসি বিনিময় করে বন্ধু-বান্ধবের হক আদায় করতে হয়। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে হাসতেন তাকে মুচকি হাসি বলা যেতে পারে। তাঁর হাসিতে (কয়েকটি ঘটনা ছাড়া) জীবনে কখনও দাঁত দেখা যায়নি। যে হাসিতে দাঁত দেখা যায় না সে হাসি কখনও উচ্চস্বরে হয় না। আর এই মুচকি হাসিই মুসলমানের হাসি।

তাবলীগের চিল্লা কি ও কেন?

৪০ সখ্যা হতে চিল্লার উৎপত্তি। সংখ্যা অনুযায়ী ৪০ হলে এর হিসাব সাধারণতঃ সয়ময়ানুপাতে দিন, মাস বা বছরের সাথে যুক্ত থাকে। রূহানী উন্নতির পথে চিল্লা কথাটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।

হযরত আদম(আঃ) ও চল্লিশ

হযরত আদম(আঃ)কে যখন নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের পর দুনিয়াতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তারপর যে পর্যন্ত তার কান্না-কাটিতে ১০৫ মাস x ৪০=৩৫০ বছর অতিক্রান্ত না হয়েছিল সে পর্যন্ত তাঁর গুনাহ মাফ হয় নাই।

হযরত নূহ (আঃ) ও চল্লিশ

হযরত নূহ (আঃ) তাঁর উম্মতসহ যে নৌকায় আরোহন করেছিলেন তাতে তিনি উম্মতসহ ৪০দিন পর্যন্ত আল্লাহর ওপর ভরসা করে কাটিয়েছেন। তার পর নৌকা মাটি স্পর্শ করলে তিনি উম্মতসহ অবতরণ করেন।

হযরত ইউনুছ (আঃ) ও চল্লিশ

হযরত ইউনুছ (আঃ) মাছের পেটে ৪০দিন পর্যন্ত থেকে এ দোয়া পাঠ করেন, لَآاِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

যদি তিনি উক্ত দোয়া পাঠ না করতেন তবে তাঁকে কিয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতে হত। এতে বোঝা গেল হযরত ইউনুছ (আঃ) মাছের পেটে ৪০দিন পর্যন্ত ছিলেন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও চল্লিশ

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নমরূদ কর্তৃক যে আগুণে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তাতেও তিনি ৪০দিন পর্যন্ত ছিলেন। আল্লাহর কুদরতে তাঁর একটি পশমও পুড়ে নাই। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলেন, আমি যত দিন আগুণে ছিলাম এত আরামের জীবন আমি ইতিপূর্বে কখনও পাই নাই।

হযরত মূসা (আঃ) ও চল্লিশ

হযরত মূসা (আঃ) ৪০ দিনের সময়সীমার ভিতরে সম্পূর্ণ তাওরাত কিতাব প্রাপ্ত হন।

হযরত সোলামান (আঃ) ও চল্লিশ

হযরত সোলামান (আঃ)এর হাতের আংটি হারিয়ে গেলে তিনি ৪০দিনের জন্য স্বীয় রাজত্ব হারান।

উক্ত ৪০ দিনে কেউ তার কথায় কর্ণপাতও করেনি। কেউ তার কোন হুকুমও পালন করে নাই।

হুজুরে আকরাম (সাঃ) ও চল্লিশ

আমাদের প্রিয়নবী (সাঃ)কেও ৪০ বছর বয়সে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবুয়ত প্রদান করেন। কারণ চল্লিশের আগে মানুষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।

আম্বিয়া (আঃ) ও চল্লিশ

একমাত্র হযরত ঈসা (আঃ) ছাড়া সকল নবীকেই ৪০ বছরের আগে নবুয়ত প্রদান করা হয় নাই।

মায়ের গর্ভে তিন চিল্লা

মায়ের গর্ভে প্রতিটি মানব সন্তানের তিন চিল্লা পুরা না হলে তার দেহে আসমানী রূহ প্রদান করা হয় না।

একটি শিশুকে মায়ের গর্ভে যেভাবে তিনচিল্লা পুরা করতে হয়

১ম চিল্লায় রক্তের ফোটা। ২য় চিল্লায় মাংশ পিণ্ড। ৩য় চিল্লায় পূর্ণ শরীর গঠন হলে ফেরেশতাগণ আল্লাহর হুকুমে রূহ ফুকে দেন।

চল্লিশ বছরে মানুষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়

একটি মানব সন্তানের যখন কেবল ৪০বছর পূর্ণ হবে তখনই তার শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহ পূর্ণতা লাভ করে।

৪০ দিন তাকবীরে উলার সাথে কেউ নামাজ আদায় করলে ছওয়াব

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, যদি কোন ব্যক্তি ৪০দিন ধারাবাহিকভাবে তাকবীরে উলার সাথে নামাজ আদায় করে তবে তার জন্য দু'টি পুরস্কার রয়েছে। ১ম জাহান্নাম হতে মুক্তি, ২য়টি হচ্ছে মুনাফেকীর দরজা হতে নাম কেটে দেয়া হয়।

চল্লিশ এর সাথে বিভিন্ন কোর্সের সম্পর্ক

পৃথীবির বহু দেশে ৪০ দিনে কোর্স পুরা করার পদ্ধতি চালু রয়েছে। এবং অনেকের ধারণা চল্লিশ দিনে কোন বস্তু পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য যথেষ্ট। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে এ যাবৎ এ রীতি এভাবে চলে আসছে যে, আল্লাহওয়ালা এবং বিভিন্ন পীর মাশায়েখদের দরবারে মুরিদদেরকে অজিফাসমূহ চল্লিশ দিনের মাধ্যমে পুরা করাতেন।

তিন চিল্লা কেন দিতে হবে

মানুষকে তিন চিল্লা লাগানোর প্রতি এজন্য উৎসাহিত করা হয় যে, মানব সন্তান যেমনি ভাবে মায়ের গর্ভে তিন চিল্লা পুরা হলে রূহ প্রাপ্ত হয়, তেমনি ভাবে দুনিয়াতে আল্লাহর রাস্তায় তিন চিল্লা সময় অতিবাহিত করলে তার মধ্যে ঈমানী মজবুতি পয়দা হয়। মানুষের জন্য মাতৃগর্ভ দেহ গঠনের স্থান আর দুনিয়া হল ঈমান আর আমল গঠনের স্থান।

তাই এখানে যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় তিন চিল্লা দিবে তার প্রথম চিল্লায় দিলের জং দুর হবে, দ্বিতীয় চিল্লায় ঈমানী রং ধরবে, আর তৃতীয় চিল্লায় আমলের ঢং প্রকাশ পাবে। অর্থাৎ প্রথম চিল্লায় চাষ, ২য় চিল্লায় বীজ বপণ এবং ৩য় চিল্লায় আমলের ফসল ফলে।

যে মহলে থেকে মানুষের ঈমান-আমল বরবাদ হয়েছে সে মহল ছাড়তে হবে। যদি অফিস, কল কারখানা, বাড়ী-গাড়ী ইত্যাদিতে থেকে মানুষের ঈমান আর আমল ঠিক হত তবে বয়সে যারা বৃদ্ধ তারাই সব চেয়ে ঈমান ওয়ালা হত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় চুল-দাড়ী পেকে গেলেও মানুষের ঈমান-আমল পাকে না। গাড়ী নষ্ট হয় রাস্তায় আর ঠিক হয় গ্যারেজে। মানুষ অসুস্থ হয় বাড়ীতে কিন্তু তার চিকিৎসা হয় হাসপাতালে।

পৃথিবীর বুকে স্থান হিসেবে সর্বোৎকৃষ্ট স্থান হলো মসজিদ, আর কাজ হিসেবে উচু কাজ হল দাওয়াতের কাজ। কাজেই আপনাকে আমাকে সংশোধন হতে হলে দাওয়াতের কাজে তিন চিল্লা লাগিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলে তবেই আশা করা যায় পরকালীন মুক্তি। হে আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে সর্বদা তোমার দ্বীনের কাজ করার তাওফিক দান কর। আমীন।

মুবাল্লিগ ভাইদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ

মুসলমানের পরিচয়

আমি আমার সারা জীবন, আমার স্বাস্থ্য, আমার শক্তি, আমার সম্পত্তি, আমার যথা সর্বস্ব সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের ভিতরে থেকে খরচ করব। আল্লাহ্‌র অনুগত্যের বাইরে খরচ করব না। এই অঙ্গীকার করে যে মুসলমান জাতিভূক্ত হয় তাকে বলে মুসলমান।

এই আনুগত্যের আদর্শ হবে একমাত্র মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের আদর্শ। অন্য কারুর আদর্শ গ্রহণ করব না এবং উদ্দেশ্য হবে শুধু ক্ষণস্থায়ী ছোট জীবনের আনন্দ ভোগ নয় বরং মানুষের দুনিয়াও আখেরাতের ব্যাপক জীবনময় শান্তি ও মুক্তি। অন্তরের অন্তঃস্থলে অচল অটল, ভাবে আমাদের এই বিশ্বাস রাখতে হবে।

সংক্ষিপ্ত কথায় বলা যায় - যে আল্লাহ্‌ তায়ালার হুকুম ও রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তরিকা মেনে চলে তাকে মুসলমান বলে।

মুসলমানের করণীয় কাজ – ৫টি (১) হালাল, (২) ফরজ (৩) ওয়াজিব, (৪) সুন্নত, (৫) নফল।

মুসলমানের বর্জনীয় কাজ – ৫টি (১) কুফর (২) শিরিক (৩) হারাম (৪) বেদায়াত (৫) মাকরূহ।

ছালামের লাভ (১) ছাওয়াব পায়, (২) দোয়া পায়, (৩) তারিফ পায় (প্রশংসা)।

আল্লাহ্‌র আমানত কয়টি? (১) জান, (২) মাল, (৩) সময়, (৪) মেহনত কারীর যোগ্যতা বা ক্ষমতা।

ভাল ও খারাপ হওয়ার পন্থা

(১) দেখা, (২) শুনা, (৩) বলা, (৪) চিন্তা করা, এই চার ব্যবহার ভাল হলে মানুষ ভাল হয়, খারাপ হলে মানুষ হয় (তাই ভাল কাজে ভাল লোকের সঙ্গে থাকিবে)।

কবরে তিন প্রশ্ন প্রঃ (১) তোমার রবকে ? (২) তোমার দ্বীন কি? (৩) তোমার নবী কে ?

উঃ (১) আল্লাহ্‌, (২) ইসলাম, (৩) হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)

হাশরের ময়দানে চারটি প্রশ্ন (১) সারাজীবন কোন কাজে খরচ করেছ ? (২) যৌবনকাল কোন কাজে খরচ করেছ ? মাল কোন পথে আয় করেছ এবং কোন পথে ব্যয় করেছ ? (৪) এলেম অনুযায়ী কি পরিমাণ আমল করেছ।

শেষ বিচারের অবস্থা

(১) ঈমান ও কুফরের বিচার এই কোর্টে ক্ষমার কোন প্রশ্ন নেই।

(২) বান্দার হকের বিচার। এই কোর্টে হক দারের হক অবশ্যই আদায় করে দেয়া হবে।

(৩) আল্লাহ্‌ পাকের হক আদায়ের বিচার, এই কোর্টে আল্লাহ্‌ স্বীয় বখশিষের দ্বার খুলে দিবেন।

কথায় আছে কাজে নাই

(১) আল্লাহকে মালিক বলে কিন্তু তার কাজে মনে হয় সে স্বাধীন।

(২) রিজিকের মালিক আল্লাহ বলে কিন্তু হাতেকোন ব্যবস্থা না থাকলে পেরেশান।

(৩) আখেরাতকে আসল জীবন বলে কিন্তু কাজে দেখা যায় দুনিয়ার গুরুত্ব বেশী।

(৪) নবীর উম্মত দাবী করে কিন্তু সমালোচনা করলে দেখায়ায় নবীর দুশমুণের ত্বরিকায় কাজ করে।

(৫) দুনিয়াকে অস্থায়ী বলে। কিন্তু কাজ কর্মে দেখা যায় সে চিরকাল থাকবে, মরবে না।

১০টি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয়

(১) তওবায়-গোনাহ নষ্ট হয়, (২) ধোকায় – রেজেক নষ্ট হয়। (৩) গীবতে –আমল নষ্ট করে, (৪) বদ চিন্তায় –হায়াত নষ্ট হয়, (৫) ছদকায়–বালা দুর করে, (৬) গোস্বায় – আকল নষ্ট হয়, (৭) ঈমানের কমজুরিতে-দান খয়রাত বন্ধ করে, (৮) তাকাব্বরী - এলেম নষ্ট করে, (৯) নেকী – বদি নষ্ট করে, (১০) ইনছসাফে - জুলুম নষ্ট করে।

এক মুসলমানের অপর মুসলমানের ওপর হক

(১) দেখলে ছালাম করা, (২) সৎকাজে আদেশ করা অসৎ কাজে নিষেধ করা, (৩) ডাকলে হাজির হওয়া, (৪) মুছিবতে সাহায্য করা, (৫) হাঁচির উত্তর দেয়া, (৬)এন্তেকাল করলে কাফন দাফনে হাজির থাকা।

জ্ঞানী ব্যক্তি

দুনিয়া তাকে ত্যাগ করার আগে সে দুনিয়া ত্যাগ করে। (২) যে কবরে যাওয়ার আগে কবরের ছামান তৈরী করে, (৩) যে আল্লাহ্র কাছে হিসাব দেয়ার জন্য তৈরী হয়।

বোকা ব্যক্তি

যে দুনিয়ার জরুরতে আখেরাত হতে কার্যলয়, অনেক নেকি থাকার পরেও অন্যের দেনার ক্ষতিপূরণ দিতে দিতে অন্যের গোনা মাথায় নিয়ে দোযখে যাবে (অর্থাৎ যে এখানে জুলুম করে)

মৃত্যুর সময় ভাগাভাগী

(১) মাল ওয়ারিশের (২) রূহ, আজরাইলের (৩) গোস্ত, পোকামাকড়ের, (৪) হাড়, মাটির জন্য, (৫) ঈমানের উপর শয়তানের হামলা, (৬) নিজের জন্য আমল।

মানুষের শ্রেণী বিভাগ

১। (ক) ঈমান (খ) আমল (গ) প্রচার ওয়ালা

২। (ক) ঈমান আছে, (খ) আমল ওয়ালা, (গ) প্রচার নাই,

৩। (ক) ঈমান আছে, (খ) আমল নাই, (গ) প্রচার নাই,

৪ (ক) ঈমান. (খ) আমল, (গ) প্রচার, কোনটাই নাই, সে কাফের কঠিন শাস্তিরযোগ্য।

৩টি অপরিহার্য গুণের কথা

(১) এখলাছ অর্থ – ৩টি থেকে বিরত থাকার নাম। (ক) অর্থ, (খ) শর্ত (গ) ব্যক্তিত্ব। (২) মেহনত – (নিরলস ভাবে কাজে লেগে থাকার নাম) (৩) শফ্কৃত অর্থ– জরুরত মোতাবেক বা প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ সমাধা করে দেয়ার নাম।

কামিয়াবীর পূর্বশর্ত

(১) যোশ অর্থঃ– পূর্ণ আকাংখা উদ্যম থাকার নাম। (২) হুশ অর্থঃ পর্যায়ক্রমে কাজ চালিয়ে যাওয়ার নাম। (৩) এস্তেকামত অর্থঃ– কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অটল অনড় থাকার নাম।

তিন ব্যক্তি বিনা হিসেবে বেহেস্তে প্রবেশ করবে

(১) আদেল বাদশাহ, (২) কোরআনের বাহক যিনি তাতে কোন অতিরঞ্জিত করেন নি, (৩) যে ব্যক্তি জান-মাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়।

তিন ব্যক্তি বিনা হিসাবে জাহান্নামের যাইবে

(১) বদ মেজাজ ও অহংকারী ব্যক্তি। (২) যাহারা নবীর সহিত শক্রতা রাখে। (৩) জীব জন্তর ছবি অংকার কারী।

মোমিনদের জন্য সাতটি গরুত্বপূর্ণ নসীহত

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রাঃ) মুনাব্বেহাত গ্রন্থে লিখেছেন। হযরত ওছমান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, খিজির (আঃ) ভগ্ন দেওয়ালের নীচ হতে এতিম ছেলেদের জন্য যে সম্পদ রের করেছিলেন, তা ছিল একটা স্বর্ণের পাত তাতে নিম্ন লিখিত ৭টি লাইন লেখা ছিল।

১। আমি আশ্চার্য্য বোধ করি ঐ ব্যক্তির উপর যে মউতকে নিশ্চিত ভাবে জেনেও কেমন করে হাসে।

২। আমার আশ্চার্য্য লাগে ঐ ব্যক্তির উপর যে এটা জানে যে এ দুনিয়া একদিন খতম হবে। তবুও কেমন করে দুনিয়ার দিকে আকৃষ্ট হয়।

৩। আমার আশ্চার্য্য লাগে ঐ ব্যক্তির উপর যে এটা জানে যে সব কিছুই আল্লাহ্র তরফ হতে নির্দ্দিষ্ট হয়ে আছে (অর্থাৎ তকদিরে বিশ্বাস করে) তবুও তার কোন জিনিষ হাসেল না হলে কেন আফছোছ করে।

৪। আমার আশ্চার্য্য লাগে ঐ ব্যক্তির উপর যার আখেরাতে হিসাব দেয়ার পূর্ণ বিশ্বাস আছে, তবুও সে ধন সম্পদ জমা করে।

৫। আমি আশ্চার্য্য বোধ করি ঐ ব্যক্তির উপর যে জাহান্নামের আগুন বিশ্বাস করে, তবুও সে কেমন করে গোনাহ করে।

৬। আমি আশ্চার্য্য বোধ করি ঐ ব্যক্তির উপর যে আল্লাহ্ পাককে জানে, তবুও সে কেমন করে অন্য জিনিষের আলোচনা করে।

৭। আমার আশ্চার্য্য লাগে ঐ ব্যক্তির উপর যে বেহেশতের সুখ শান্তির কথা জানে তবুও সে কি করে দুনিয়ার কোন জিনিষের দ্বারা শান্তি পায়।

তাবলীগে ১২টি কাজ

৪টি কাজ বেশী বেশী করিব যথা- (ক) দাওয়াত, (খ) তালিম (গ) জিকির (ঘ) ইবাদত (খেদতম)।

৪টি কাজ কম করি

(ক) কম খাব, (খ) কম ঘুমাব, (গ) কম কথা বলব, (ঘ) মসজিদের বাইরে কম সময় কাটাব।

৪টি কাজ মোটেই করিব না যথা

(ক) ছওয়াল করবনা, (খ) ছওয়ালের ভান করব না, (গ) বিনা এজাজতে কাহারও কোন কিছু ব্যবহার করব না, (ঘ) প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করব না।

তারুফী বয়ান কিভাবে করতে হবে

আল্হামদুল্লিাহ! আল্লাহ পাকের বহুত বড় এহ্ছান আর ফজল ও করম, তিনি নিজ দয়ায়, নিজ মায়ায় আমাদের সকলকে মসজিদে আসার তৌফিক দান করেছেন।

আল্লাহ পাক যাদের পছন্দ করেন, তাদেরই মসজিদে আসার তৌফিক দান করেন। তারপর দ্বীনের এক ফিকির নিয়ে বসার সুযোগ দিয়েছেন। এক লাখ বা দুই লাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর যে কাজ করে গেছেন।

কোরআনে ঘোষণা এই যে, হে দুনিয়ার মানুষ তোমরা আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করে নাও, তোমরা কামিয়াব হয়ে যাবে অর্থাৎ সকলেই জান্নাতি হয়ে যাবে। দ্বীনকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সমস্ত নবীও পয়গম্বর কষ্ট ও মোজাহাদা সহ্য করেছেন।

হযরত ইব্রাহিম (আঃ) নমরুদের আগুনে প্রবেশ করেছেন। হযরত ইউনুছ (আঃ) মাছের পেটে গিয়েছিলেন। হযরত ঈসা (আঃ) পরে ছয়শত বৎসরের উর্দ্ধে দ্বীনের দাওয়াত না থাকার কারণে কাবা গৃহে ৩৬০টি দেবমুর্ত্তি আশ্রয় নিয়েছিল। আখেরী নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্ত হয়ে দ্বীনের দাওয়াত যখন মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌছাতে লাগলেন তখন তাঁকে অপমাণিত ও লাঞ্চিত হতে হয়েছে। যে দেহে মশামাছি পড়া হারাম ছিল, সেই দেহে তায়েফ বাসীরা পাথর

মেরে সারা দেহ রক্তাক্ত করেছিল, এমন কি তাঁহার জুতা মোবারক পায়ে আটকে গিয়েছিল। তবুও তিনি তাদের অভিশাপ দেন নাই।

হুজুর পাক (সাঃ) দ্বীন প্রচারে বিফল হয়ে আল্লাহ পাকের হুকুমে মদিনায় হিজরত করেন। মদীনা বাসীরা তাঁকে জান মাল সময় দিয়ে নছরত করেন, তখন দ্বীন জিন্দা হয়। যারা হিজরত করিয়াছিল তাহারা মোহাজের নামে এবং যারা নছরত করিয়াছিল তারা আনছার নামে পরিচিত। আল্লাহ পাক কোরআনে আনছার ও মোহাজেরদের সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। হুজুর পাক (ছঃ) বলেছেন, "তোমরা যদি একটি কথাও জান তবে অন্যের নিকট পৌছিয়ে দাও"। ভাই দ্বীনের দাওয়াতের এক নকল হরকত নিয়ে এক মোবারক জামাত, আপনাদের মসজিদে উপস্থিত। জামাত এই মসজিদে ৩দিন থাকবে, কোন কোন ভাই নছরত করার জন্য তৈরী আছেন।

তাবলীগের পরামর্শ কি ও কেন?

সারা আলমের দ্বীনের তাকাযাকে সামনে রেখে সাথী ভাইদের খেয়াল নিয়ে আগামী ২৪ ঘন্টা কাজের একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। ৩ টি বিষয়ের উপর পরামর্শ করব। (১) কিভাবে এলাকা থেকে নগদ জামাত বের করা যায় তার ফিকির করা। (২) নিজে ও সাথী ভাইদের কি ভাবে জ্ঞানী, গুনি, কর্মঠ কর্মী ও দায়ী বনে যাই। (৩) এলাকায় যদি মসজিদওয়ারী ৫ কাজ চালু থাকে তবে জোরদার করা আর না থাকলে চালু করা।

পরামর্শ করলে লাভ

(১) পরামর্শ করা আল্লাহর হুকুম, নবীর সুন্নত, মোমীনের ছেফাৎ।

(২) পরামর্শ করে কাজ করলে খায়ের বরকত হয়।

(৩)পরামর্শ করে কাজ করলে জোড় মিল, মহব্বত পয়দা হয়।

(৪) পরামর্শ করিয়া কাজ করলে তোড় খতম হয়।

(৫) পরামর্শ করে কাজ করলে আজাব গজবের ফয়ছালা আল্লাহপাক উঠিয়ে নেন।

(৬) পরামর্শ করে কাজ করলে উত্তম বদলা অতিশীঘ্র পাওয়া যায়।

(৭) পরামর্শ করে কাজ করলে অহীর বরকত পাওয়া যায়।

পরামর্শ করার আদব

(১) পরামর্শের আগে একজন জিম্বাদার না-বালেগ পাগল, ও মহিলা না হয়।

(২) ডানদিক থেকে খেয়াল পেশ করা।

(৩) কাহারও খেয়াল কেহ না কাটা।

(৪) দীল থেকে, দ্বীনের দিকে মোতাওয়াজ্জা হয়ে খেয়ালপেশ করা।

(৫) আমার খেয়াল অনুযায়ী রায় হলে খুশী না হওয়া, এস্তেগফার পড়া কারণ খারাপি আস্‌লে আমি দায়ী হয়ে যাব।

(৬) আমার খেয়াল অনুযায়ী রায় না হলে বেজার না হওয়া, আল্‌হামদুলিল্লাহ পড়া।

(৭) পরামর্শের আগে কোন পরামর্শ না করি। পরামর্শের পরে কোন সমালোচনা না করি।

(৮) জিম্মাদার যে ফয়ছালা দেন, তাহা বিনা আপত্তিতে মেনে নেয়া।

(৯) জিম্বাদার ইচ্ছা করলে সাথীদের খেয়াল না নিয়ে ফয়সালা দিতে পারেন।

তালিম কত প্রকার ও কি কি?

তালিম ৪ প্রকারঃ (১) কেতাবি তালিম, (২) কোরানী তালিম, (৩) ৬ গুণের আলোচনা, (৪) ফরজিয়াতের আলোচনা।

তালিমের উদ্দেশ্য ঃ কেতাবি তালিমের ফাজায়েলের বর্ণনা দ্বার দিলে দ্বীনি এলেমের ও আমলের ছহী তলব বা খাহেশ পয়দা করা।

তালিমের লাভ ঃ (১) তালিমের দ্বারা এলম আসে, এলমের দ্বারা আমল সুন্দর হয়, (২) তালিমের দ্বারা আল্লাহপাক দুনিয়া ও আখেরাতের ইজ্জতের সঙ্গে পালেন, (৩) তালিমের দ্বারা আছমানি নুর হাছেল হয়, (৪) তালিমের দ্বারা দিলের জাহিলিয়াত ও অজ্ঞতা দুর হয়, (৫) তালিমের দ্বারা অহির বরকত পাওয়া যায়, (৬) আল্লাহ পাকের খাশ রহমত নাজিল হয়, (৭) তালিমের মজলিসকে ফেরেস্তারা চর্তুদিকে বেষ্টন করে রাখে, (৮) তালিমের মজলিসকে আছমান বাসীরা ঐরূপ উজ্জল দেখেন যেরূপ দুনিয়া বাসীরা আসমানের তারকা রাশিকে ঝলমল করতে দেখেন।

হাসিল করার তরিকা বসবার আদব ঃ- (১) সুন্নত তরিকায় বসা, (২) গোলাকারে গায় গায় মিলে বসা, (৩) মোজাহাদার সঙ্গে বসি, (৪) জরুরত দাবাইয়া বসি।

শুনিবার আদব ঃ- (১) দিলের কানে শুনি, (২) আমলের নিয়ত শুনি, (৩) অন্যের নিকট পৌছানের নিয়ত শুনি, (৪) মোতাকাল্লেমের দিকে তাকাইয়া শুনি।

আল্লাহপাকের নাম শুনলে জাল্লাজালা লুহু, হুজুরের নাম শুনলে (ছঃ) বলি, নবী ও ফেরেশতাদের নাম শুনিলে (আঃ) বলি। ছাহাবীদের নাম শুনলে (রাঃ) আনহু বলি এবং মেয়ে ছাহাবীদের নাম শুনলে (রাঃ) আনহা বলি। বোজরগানের নাম শুনলে (রাঃ) বলি।

গাস্তের আদব কত প্রকার ও কি কি?

(১) খুছুচি, (২) উমুমী ,(৩) তালিমী, (৪) তাশকিলী, (৫) উসুলী।

গাস্ত ফার্সি শব্দ অর্থ দ্বীনের কাজে ঘোরাফিরা। দ্বীনের কাজে এক সকাল বা এক বিকাল ঘোরাফিরা করা দুনিয়ায় যত নেক আমল আছে তার চেয়ে উত্তম। দ্বীনের দাওয়াত সমস্ত আমলের মেরুদন্ড। দাওয়াত থাকবে তো দ্বীন থাকবে, দ্বীন থাকবে তো দুনিয়া থাকবে। দাওয়াত থাকবে না, দ্বীন থাকবেনা, দুনিয়াও থাকবে না।

(ক) দ্বীনের জন্য দাওয়াত এত জরুরী যেমন মাছের জন্য পানি জরুরী।

(খ) দেহের জন্য যেমন মাথা জরুরী, দ্বীনের জন্য দাওয়াত তত জরুরী।

এই দ্বীনকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এক লাখ বা দুই লাখ ২৪ হাজার পয়গম্বরগণ একই কালেমার দাওয়াত নিয়ে এসেছেন। তোমরা কালেমা স্বীকার কর তা হলে কালিয়াবী হইয়া যাবে। এখন আর কোন নবী আসবেনা।

তাবলীগের কাজে বের হলে কি কি লাভ হয়

(১) প্রতি কদমে ৭০০ করে নেকি পাওয়া যাবে, ও ৭০০ গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।

(২) এই কাজে পায়ে যে ধূলাবালি লাগবে তাহা ও দোজখের আগুন একত্রিত হবেনা, (৩) প্রতি কথায় ১ বৎসর নফল ইবাদতের ছওয়াব পাওয়া যাবে।

(৪) দাওয়াতের কাজে কিছু সময় অপেক্ষা করলে, শবে কদরের রাত্রে কাবা শরীফে সারা রাত্রি দাঁড়াইয়া ইবাদত করার ছওয়াব হইতেও উত্তম।

দাওয়াতের কাজে ৮ শ্রেণীর লোক লাগে

দাওয়াতের কাজে দুই জামাতে ৮ শ্রেণীর লোক লাগবে। মসজিদে ৪ শ্রেণী যথা – (ক) একজন মোতাকাল্লেম দ্বীনের আলোচনা করিবেন (খ) কয়েকজন মামুর আলোচনা শুনিবেন।(গ) একজন জিকিরে থাকবেন। (ঘ) একজন এস্তেকবালে থাকবেন।

দাওয়াতের কাজে মসজিদের বাহিরে ৪ শ্রেণীর লোক থাকবে

(ক) একজন স্থানীয় রাহাবর, (খ) মোতাকাল্লেম, (গ) কয়েকজন মামুর, (গ) একজন জিম্বাদার, রাহাবরের কাজ কোন বাড়ীতে গিয়ে লোককে কাজ থেকে ফারাক করে এনে মোতাকাল্লেমের নিকট পৌঁছাইয়া দিবেন। মোতাকাল্লেম তাহাকে আজিজির সহিত নরম ভাষায় তৌহিদ, আখেরাত ও রেছালাত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবেন যে আমরা একদিন ছিলাম না, এখন আছি, আবার একদিন থাকব না। আমরা প্রত্যেকেই শান্তি চাই এই শান্তি কি ভাবে আসবে আল্লাহর হুকুম মান্‌লে হুজুর পাক (ছঃ) তরিকায় চললে দু'জাহানে শান্তি ও কামিয়াবী, এই কথার বিশ্বাস আমার দিলে আপনার দিলে, কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত আনেওয়ালা উম্মতের দিলে আসে ও মজবুত হয়।

এই জন্য হুজুর পাক (সঃ) তরিকায় মেহনত করতে হবে। এই সম্পর্কে সমজিদে জরুরী আলোচনা হল আপনি নগদ মসজিদে চলুন, ঐ ব্যক্তি যদি আসে একজন মানুষকে দিয়ে মসজিদে পাঠিয়ে দিতে হবে। অন্যাথায় তাকে হাঁ এর উপর রেখে আস্‌তে হবে। মামুরদের মুখে থাকবে জিকির, দিলে থাকবে ফিকির, হে আল্লাহ্ মোতাকাল্লেমের মুখ দিয়ে এমন কথা বের করা যাতে ঐ ব্যক্তির দিল মসজিদ মুখী হয়ে যায়।

জামাত যখন দাওয়াতের কাজে প্রথম কদম উঠাবে, দ্বিতীয় কদম উঠানের আগে আল্লাহ পাক তাদের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিবেন। রাস্তার ডান দিক দিয়ে চলবে, চক্ষুকে হেফাজত করে চলেবে, এলাকা লম্বা হইল শেষ প্রান্ত থেকে দাওয়াত দিয়ে মসজিদে ফিরে আসতে হবে। এলাকা গোলাকার হলে ডান দিক

থেকে দাওয়াত দিয়ে মসজিদে পৌঁছতে হবে। দাওয়াত শেষে আস্তাগফার পড়তে পড়তে মসজিদে পৌঁছতে হবে। জামাতে যোগ দান করার পর যার জরুরতে যাবে।

মাগরিব বাদ বয়ান করার নিয়ম

ভাই ও দোস্ত বোজর্গ আল্লাহ পাকের এহছান ফজল ও করম, আমরা বিভিন্ন গোত্রের লোক একত্রিত হয়ে মাগরিবের ফরজ নামাজ আদায় করেছি এবং তার পর দ্বীনের এক ফিকির নিয়ে বসতে পেরেছি, তার জন্য আমরা আল্লাহর শোকর আদায় করি, সকলে বলি আল্‌হামদুলিল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালা কোরআন পাকে এরশাদ করেন (লায়িন শাকার তুম লা-আজিদান্নাকুম, ওয়ালায়িন কাফার তুম ইন্না আজাবি লা-শাদীদ)। আমার নেয়ামত পেয়ে যে নেয়ামতের শোকর গুজারী করে আমি তার নেয়ামত বা ড়িয়ে দেই এবং যে নিয়ামতের অস্বীকার করে আমি তার নিয়ামত ছিনিয়ে নেই ও আজাবে গ্রেপ্তার করি।

সমগ্র মানব জাতির সুখ শান্তি সফলতা কামিয়াবী আল্লাহ তা'য়ালা একমাত্র দ্বীনের মধ্যে রেখেছেন। দ্বীন জিন্দেগীতে তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন তার জন্য মেহনত করা হবে। সুতরাং যে কেহ খাছ নিয়তে নিজের জান মাল, সময় নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে ছহী তরিকায় মেহনত করবে ইন্‌শাআল্লাহ অতি সহজেই তার মধ্যে পূরা দ্বীনের উপর চলার যোগ্যতা পয়দা হবে। দ্বীন আল্লাহর নিকট বড়ই মাহবুব। দ্বীন দুনিয়ার বুকে দাওয়াতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দাওয়াত হচ্ছে ঈমানের মেহনত। হযরত ইছা (আঃ) পরে ছয়শত বৎসরের উর্দ্ধে দাওয়াতের কাজ না থাকার কারণে বাইতুল্লাহর ঘরে ৩৬০ টি মূর্তি উঠেছিল, আবার তারাই ঈমান আনার পর মুর্ত্তিগুলো বের করে দিয়াছিল।

আল্লাহ পাক কোরআনে বলেছেন "দুনিয়াটা আখিরাতের ক্ষেত স্বরূপ"। দুনিয়ার জীবন হল কামাইয়ের জায়গা আর আখিরাত হল ভোগের জায়গা। কামাইয়ের জায়গা হল মানুষ যেখানে কষ্ট করে। কৃষি, চাকুরী, ব্যবসা হল কামাইয়ের জায়গা। আর ঘর বাড়ী হল ভোগের জায়গা। এখন কামাইয়ের জায়গা যদি বাড়ী ফিরে সে কিছুই ভোগ করতে পারবেনা। ঠিক তেমনি দুনিয়া হল মুমীনের জায়গা। যে দুনিয়াতে কষ্ট করে ঈমান আমল বানাবে, সে মহা আনন্দে আখিরাতের বাড়ী ফিরে মনে যা চায় তাই সে ভোগ করবে। আর

দুনিয়াতে যে কামাই না করে, কেবল ভোগের চিন্তা করবে, আরাম আয়েশের চিন্তা করবে, তাকে আসল আখিরাতে খালি হাতে ফিরে কেবল কষ্টই ভোগ করতে হবে।

আল্লাহ পাক মানুষ সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদত বন্দেগী করার জন্য। আর আল্লাহপাক ১৭,৯৯৯ মাখলুক সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের খেদমতের জন্য আর মানুষ কে ঐশ্বর্য্য ও সম্পদের মধ্যে শান্তি, কামিয়াবী সফলতা রাখেন নাই। শান্তি, কামিয়াবী সফলতা রেখেছেন ঈমান ও আমলেন মধ্যে। যে ৫টি বস্তর জন্য মানুষ সব সময় আকাংখিত, এই ৫টি জিনিষ আল্লাহ পাকের কুদরতি হাতে, যা আল্লাহ পূরণ করবেন কালকিয়ামতে। মানুষ শত চেষ্টা করলেও তা হাছেল করতে পারবে না। **এই বস্ত হইল ঃ**

(১) অনন্ত জীবন (২) অনন্ত যৌবন (৩) কোমল শয্যা সুরম্য বিশিষ্ট বাড়ী (৪) খাদ্য সামগ্রী (৫) সুন্দর সুন্দর নারী।

তাশকিল করার নিয়ম

আল্লাহপাক বলেছেন আমার হুকুম ও রাসুলের তরিকামতে দুনিয়াতে বসবাস করে ঈমান ও আমল তৈরি কর। তাহলে আখেরাতে চাহিদার জিন্দেগী পূর্ণ হবে। না দেখা বস্তর উপর বিশ্বাস আনার নাম হইল ঈমান। ঈমান দুনিয়ার কোথাও কিনতে পাওয়া যায় না। ইহা হাছেল হবে একমাত্র দাওয়াতের মাধ্যমে। দাওয়াত থাকবে তো দ্বীন থাকবে, দ্বীন থাকবে, তো দুনিয়া থাকবে। দাওয়াত থাকবে না, দ্বীনও থাকবে না। দুনিয়াও থাকবে না। আল্লাহ পাক দুনিয়া নিজাম ভেঙে দিবেন। আল্লাহপাক আমাদেরকে অতি অল্প সময়ে জন্য দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। এই সামান্য সময়ের মধ্যে ঈমান আমল তৈরির জন্য জান, মাল সময় নিয়ে ১ চিল্লা ৩ চিল্লায় আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়ার জন্য কে কে রাজী আছেন খুশি খুশি বলেন।

ফজর বাদ বয়ান করিবার নিয়ম

আলহামদুলিল্লাহ. সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ পাকের, যিনি আমাদেরকে অর্ধমৃত্য অবস্থার থেকে জাগাইয়া আল্লাহপাকের মহান হুকুম ফজরের দুই রাকাত ফরজ নামাজ মসজিদে এসে জামাতে তকবীর উলার সাথে আদায় করার

তৌফিক দান করেছেন। এশার নামাজ বাদ আমারা কয়েক দলে বিভক্ত হয়ে গিয়াছিলাম। একদল রাত্রিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে সারা রাত্রি ইবাদতে মশগুল ছিলেন। আর এক দল সারারাত্রি ঘুমে কাঁটিয়ে দিয়েছেন, তাদের পাপও নাই পূর্ণও নাই। আর এক দল রাত্রিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে সারা রাত্রি জেনা, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি ও দস্যুবৃত্তি করে কাটিয়ে দিয়েছেন। কাহারো নিদ্রা চির নিদ্রায় পরিণত হয়েছে। কেহ হাসপাতালে সারা রাত্রি অসান্তিতে কাঁটিয়ে দিয়েছেন। কোন ব্যক্তি ফজরের আজান শুনে উত্তম রূপে অযু করে মসজিদের দিকে রওনা হয়। কেমন যেন এহ্‌রাম বেধেঁ হজ্বের দিকে রওনা হল। তার প্রতি কদমে একটি করে নেকি লেখা হয়। ও একটি করে গুনাহ মাপ হয়ে যায়। মসজিদে যত সময় নামাজের জন্য দেরি করবে তত সময় নামাজেরই ছওয়াব পেতে থাকবে।

নামাজী ব্যক্তি যত সময় নামাজে থাকবে তত সময় আল্লাহর রহমত বৃষ্টির মত পড়তে থাকবে। দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করলে কেরাতের প্রতি হরফে ১০০ করে নেকী পাবে। বসে পড়লে ৫০ নেকী করে পাবে।

প্রথম তাকবিরে শরীক হওয়া দুনিয়ায় যত নেক আমল আছে তার চেয়ে উত্তম। নামাজ সর্বশ্রেষ্ঠ জেহাদ।

নামাজী যখন রুকুতে যায়, তখন তার নিজের ওজন বরাবর স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় দান করার ছওয়াব তার আমল নামায় লেখা হয়।

নামাজী যখন আত্তাহিতু পড়ার জন্য বসে তখন সে হযরত আইউব (আঃ) ও হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর মত দু জন ছওয়াব কারীর ছওয়াব পায়।

যে পর্যন্ত হুজুর পাক (ছঃ) উপর দরূদ পাঠ করা না হয়, তত সময় দোয়া আসমান ও জমিনের মাঝে ঝুলিতে থাকে।

ডান দিকে ছালাম ফেরালে বেহেশতের ৮টি দরজা খোলা হয়ে যায়। আর বাম দিকে ছালাম ফেরালে দোযখের ৭টি দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

নামাজ বাদে যদি কেহ জিকির কারীর পাশে বসে থাকে, তাহলে সে ৪জন গোলাম আজাদ করার ছওয়াব পাবে।

১টি গোলামের মূল্য ১২ হাজার টাকা, ৪টির মূল্য ৪৮ হাজার টাকা দান করার ছওয়াব পা বে।

তার পর দুই রাকাত এশার নামাজ সূর্য্য উদয়ের ২২/২৩ মিনিট পরে তবে একটি উমরা হজ্ব ও একটি কুবলিয়াত হজ্বের ছওয়াব পাবে।

আরও দুই রাকাত নামাজ আদায় করলে আল্লাহর পাক তার সারাদিনের জিম্মাদার হয়ে যাবেন।

সুরা হাশরের শেষ আয়াত পাঠ করলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৭০ হাজার ফেরেশতা তার জন্য মাগফেরাত কামনা করবেন।

মাগরিবের নামাজের পর পড়িলে সারা রাত্রি মাগফেরাতের দোয় করতে থাকেন।

১০০ বার ছোবহানা নাল্লাহ পাঠ করলে ১০০ শত গোলাম আজাদ করার ছওয়াব পাবে।

১০০ বার আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করলে যুদ্ধের ময়দানে সরু সামানা সহ ১০০ শত ঘোড়া দান করার ছওয়াব পাবে।

১০০ বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঠ করলে আসমান জমিনের ফাকা জায়গা নেকিতে ভর্তি হয়ে যাবে।

যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাহু অহদাহু লা-শারিকা–লাহু আহদান সামাদান লাম ইয়ালিদ অলাম ইউলাদ অলাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ পাঠ করবে। সে বিশলক্ষ নেকি পাবে।

হুজুর পাক (ছঃ) হাদীসে আছে (মান তামাচ্ছাকা বি সুন্নতি ইনদা ফাছাদি উম্মতি ফালাহু আজরু মিয়া সাহিদিন) যে ব্যক্তি এই ফেতনা ফাসাদের জামানায় আমার একটি সুন্নত কে আকড়ে ধরে সে ১০০ শত সহীদের ছওয়াব লাভ করবে।

এক ওয়াক্ত নামাজ যে আদায় করল সে ৩,৩৫,৫৪,৪৩২ নেকি পাইল আর সে ঐ নামাজ ছেড়ে দিল সে ২৩০,৪০ লক্ষ বছর শাস্তি ভোগ করবে। অর্থাৎ ৮০ হোকবা কাজা আদায় করলে ৭৯ হোকবা মাফ অর্থাৎ ১ হোকবা ২,৮৮ লক্ষ বৎসর শাস্তি ভোগ করবে।

যারা নামাজে আসে নাই তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েগেল। তাদের ডাকার জিম্বাদারী হুজুর পাক (ছঃ) আমাদের উপর রেখে গেছেন।

আল্লাহর ভোলা বান্দাকে ডেকে নামাজে দাড় করে দিলে কবুলিয়ত নামাজের ছওয়াব পায়া যাবে। ভাই দাওয়াতের জন্য কে কে রাজী আছেন খুশি খুশি বলুন।

রাস্তার আদব চলার আদব

রাস্তায় চলার কালে ৬টি আদব মেনে চলতে হয়। (১) রাস্তার ডানে চলি। (২) চক্ষুকে হেফাজত (নীচের দিকে) করে চলি। (৩) মুসলমান দেখিলে ছালাম দেই ও ছালামের জবাব দেই। (৪) সৎকাজের আদেশ করি অসৎকাজের নিষেধ করি। (৫) জিকিরে ফিকিরে চলি। (৬) রাস্তায় কোন কষ্ট দায়ক জিনিষ দেখলে নিজে সরাই অথবা অপ্যর ভাইকে বলে দেই।

৭টি আমলের দ্বারা সাতটি রোগের চিকিৎসা

(১) দাওয়াতের দ্বারা দ্বীলের শেরেক দুর হয়। (২) নামাজের দ্বারা দিলের কুফরী দুর হয়। (৩) এলেমের দ্বারা দিলের জাহিলিয়াত দুর হয়। (৪) জিকিরের দ্বারা দিলের গাফলতি দুর হয়। (৫) একরামের দ্বারা বেহক দূর হয়। (৬) এখ্লাসের দ্বারা দিলের রিয়া অহংকার তাক্ব্বরি দুর হয়। (৭) আল্লাহ্র রাস্তায় বের হওয়ার দ্বারা দিলে একিন পয়দা হয়।

মানুষ ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত (১) আমলে হায়ান। (২) আমলে এন্‌ছানি। (৩) আমলে ইবাদতি। (৪) আমলে খেলাফতি।

দায়ীর বিশেষ গুণ ৭ টি (১) পাহাড়ের মত অটল। (২) আকাশের মত উদার। (৩) মাটির মত নরম। (৪) সূর্য্যের মত দাতা। (৫) উটের মত ধৈর্য্য। (৬) ব্যবসায়ীদের মত হিকমত। (৭) কৃষকের মত হিম্মত।

তিন কাজে আল্লাহ্র সাহায্য আসে। (১) জিম্বাদারের অনুসরন করা। (২) মসজিদের পরিবেশ থাকা। (৩) সাথীদের সাথে জোড় মিল থাকা।

দাওয়াতে ৩ শ্রেণী বড়। (১) কাজের বড় – তাবলীগওয়ালা। (২) দ্বীনের বড়– আলেমগণ। (৩) দুনিয়ার বড় – সমাজের প্রধানগণ। (চেয়ারম্যান মেম্বার)

(১) সবচেয়ে দামী কি ? – ঈমান। (২) সকচেয়ে বেদামী কি ? – লাশ। (৩) সবচেয়ে নিকটে কি ? – মৃত্যু। (৪) সবচেয়ে দুরে কি ? – কবর।

মানুষের গুণ ২টি (১) আল্লাহ্র হুকুম পালন করা। (২) নাফরমানি করা। (২) দ্রুত কর্ম শয়তানের কাজ কিন্তু ৫টি কর্ম তাড়াতাড়ি করা বিধেয়।

(১) কন্যা বালেগ হওয়ার পরপরই বিবাহের ব্যবস্থ করা বিধেয়। (২) কর্জ তাড়াতাড়ি পরিশোধ করা। (৩) তাড়াতাড়ি মৃত্যু ব্যক্তির কাফন দাফনের ব্যবস্থা করা। (৪) তাড়াতাড়ি মেহমানের খেদমত করা। (৫) মৃত্যুর পূর্বেই আখেরাতের ছামানা জোগাড় করা।

এলান কত প্রকার ও কি কি?

ইন্‌শাআল্লাহ্ দুনিয়াবাসীদের জন্য শান্তি কামিয়াবী ইজ্জত আল্লাহ্ পাকের দ্বীনের ভিতরে। দীন কি করিয়া মানুষের মধ্যে আসে এই জন্য দ্বীনের মোবারক মেহনত নিয়ে এক জামাত আপনাদের মসজিদে উপস্থিত। নামাজ বাদ পরামর্শের জন্য সকলে বসি, বহুত ফায়দা হবে।

আসর বাদ এলান (মোনাজাতের আগে)

ইন্‌শাআল্লাহ্ দোয়া বাদ দাওয়াতের আমল নিয়ে জামাত মহল্লায় যাবে তার আদব বয়ান করা হবে, আমরা সকলে বসি, শুনলে বহুত ফায়দা হবে।

মাগরিব বাদ এলান (মোনাজাতের পর)

ইন্‌শাআল্লাহ্ বাকি নামাজ বাদ ঈমান আমলের মেহনত সম্পর্কে জরুরি বয়ান হবে, আমরা সকলে বসি শুনলে বহুত ফায়দা হবে।

অন্ধকার পাঁচ প্রকার এবং এর জন্য বাতিও পাঁচ প্রকার

হাফেজ এবনে হাজার (রাঃ) মোনাবেবহাত নামক গ্রন্থে হযরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন অন্ধকার পাঁচ প্রকার এবং এর জন্য ব্যতিও পাঁচ প্রকার। (১) দুনিয়াকে ভালোবাসা একটি অন্ধকার এর জন্য বাতি হল পরহেজগারী। (২) কবর একটি অন্ধকার তার জন্য আলো হল লা – ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। (৩) গুনাহ একটি অন্ধকার তার জন্য আলো হল তওবা। (৪) আখেরাত একটি অন্ধকার তার জন্য আলো হল আমল। (৫) পুলছেরাত হল একটি অন্ধকার উহার জন্য আলো হল এক্কিন।

আল্লাহ্ পাক কোরআন মজিদে বলেছেন, "তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব।

যে ব্যক্তি জেনে শুনে আল্লাহ্র জিকির হতে গাফেল থেকে গেল, আমি তার উপর একটা শয়তান নিযুক্ত করে দেই। সেই শয়তান সর্ব্বদা তার সঙ্গে থাকে এবং শয়তানগণ সম্মিলিত ভাবে গাফেল দিগকে সরল পথ হতে গোমরাহ কতে থাকে। অথচ তারা মনে করে যে আমরা সরল পথেই রয়েছি।

মসজিদওয়ার জামা'আত

তাবলীগের পাঁচ কাজ কি ও কেন?

১। প্রতি মাসে ৩ দিন করে আল্লাহর রাস্তায় লাগানো।

২। সাপ্তাহিক দুইটি গাশ্‌ত। (একটি নিজ মহল্লার মসজিদে, অপরটি পার্শ্ববর্তী মহল্লার মসজিদে)।

৩। প্রতিদিন দুইটি তা'লীম। (একটি নিজ ঘরে অপরটি মসজিদে)।

৪। রোজানা আড়াই ঘন্টা থেকে ৮ ঘন্টা পর্যন্ত দা'ওয়াতী মেহনত করা।

৫। প্রতিদিন অল্প সময়ের জন্য পরামর্শ করা।

মসজিদওয়ার জামা'আতের সাথী কারা?

যে মসজিদে যে সমস্ত মুসল্লী একাধিক ওয়াক্তের নামায পড়ে সে সমস্ত মুসল্লী সেই মসজিদের মসজিদওয়ার জামা'আতের সাথী। অথবা যে মুসল্লী ফজর এবং ঈশার নামায যে মসজিদে পড়ে সে সেই মসজিদের মসজিদওয়ার জামা'আতের সাথী। শুধু যারা (তাবলীগী) আমলে জুড়ে তারাই মসজিদওয়ার জামা'আতের সাথী এমন মনে করা ঠিক নয়।

প্রতিমাসে তিন দিন আল্লাহর রাস্তায় লাগানো

প্রতিমাসে সপ্তাহ নির্ধারণ করে ৩ দিনের জন্য আল্লাহর রাস্তায় লাগানো, এমন নয় যে, এক মাসে লাগালাম আর এক মাসে লাগালাম না। প্রথম মাসে ২য় সপ্তায় লাগালাম, আবার ২য় মাসে ৩য় সপ্তাহে লাগালাম। বরং প্রতি মাসে একই সপ্তাহে লাগানো। যদি প্রথম সপ্তাহে লাগাই পরবর্তী মাসগুলোতেও ১ম সপ্তাহে লাগাবো। যদি ২য় সপ্তাহে লাগাই তাহলে পরবর্তী মাসগুলোতেও ২য় সপ্তাহে লাগাবো। তবে চাঁদের মাস হিসেবে লাগালে ভাল হয়।

সপ্তাহে দুইটি গাশ্‌ত

১টি মহল্লার মসজিদেঃ নিজেদের এলাকার মাকামী কাজকে শক্তিশালী করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো মাকামী গাশ্‌ত। এটা হল দা'ওয়াতী কাজের মেরুদন্ড। মাকামী গাশ্‌ত সাধারণত সরকারী ছুটির দিন অথবা যেদিন মহল্লায় বা গ্রামে লোকজন বেশি থাকে। সেদিন হলেই ভাল হয়। যে এলাকার লোক যত বেশি মজবুতির সাথে মাকামী গাশ্‌ত করবে সে এলাকায় তত বেশি

দ্বীনের পরিবেশ চালু হবে। দ্বীনদার বাড়বে, নামাযী বাড়বে। পুরা সপ্তাহ মাকামী কাজের জন্য এমনভাবে চেষ্টা ফিকির করা যাতে প্রতি সাপ্তাহিক গাশ্তের থেকে ৩ দিনের জামা'আত বের হতে পারে। সাপ্তাহিক গাশ্তের দিনকে খুশির দিন, ফসল কাটার দিন মনে করা, পুরা সপ্তাহের দা'ওয়াতী মেহনতের ফসল কাটা হয় মাকামী গাশ্তের দিনে, মহল্লায় মেহ্নত করে মাকামী গাশ্তের সাথী বাড়ানোর চেষ্টা করা। যাদেরকে সপ্তাহ ভর দা'ওয়াত দেয়া হল তাদেরকে মাকামী গাশ্তে অবশ্যই জুড়ানো। যদি না জুড়ে পরবর্তী সপ্তাহ আবার তার পিছনে মেহ্নত করতে হবে। এভাবে মাকামী গাশ্তের মাধ্যমে এলাকার মধ্যে, মহল্লার মধ্যে, গ্রামের মধ্যে দ্বীনি পরিবেশ কায়েম করার জন্য মেহ্নত করা। আর এভাবে মেহ্নত চালু থাকলে আল্লাহর রহমত, বরকত, অবতীর্ণ হতে থাকবে আর বদদ্বীন পরিবেশ দুর হতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা আযাব, গযব, ফেৎনা, ফাসাদ উঠিয়ে নিবেন।

তবে হ্যাঁ এ জন্য শর্ত হল যে, দিন এবং ওয়াক্ত নির্ধারণ করে নেয়া। এমন নয় যে, এক সপ্তাহ রবিবারে আছরের পর গাশ্ত করলাম, এভাবে করলে লোকই পাওয়া যাবে না। (আল্লাহতা'আলা আমাদের সবাইকে আমল করার তাওফীক দান করুন)।

২য় গাশ্তটি মহল্লায় করা

নিজের মহল্লায় মাকামী গাশ্ত চালু হয়ে যাওয়ার অর্থ হল মহল্লায় আল্লাহর রহমত, বরকত, চালু হয়ে যাওয়া। নিজ মহল্লায় যখন আল্লাহর রহমত, বরকত চালু হয়ে যাবে তখন পার্শ্ববর্তী মহল্লা থেকে বিভিন্ন খারাবী মহল্লায় ঢুকতে চেষ্টা করবে। এইসব খারাবী থেকে নিজ মহল্লাকে হেফাজত করার চেষ্টা করবে। এইসব খারাবী থেকে নিজ মহল্লাকে হেফাযত করার জন্য পার্শ্ববর্তী মহল্লার মানুষদেরকে দ্বীনের উপর উঠানোর জন্য পার্শ্ববর্তী মহল্লায় ২ য় গাশ্ত করা একান্ত জরুরী। যার ২য় গাশ্ত ঠিকমত হবে সে ১ম গাশ্ত ও ঠিকমত করতে পারবে। দ্বিতীয় গাশ্তের মজবুতির উপর নিজ মহল্লার গাশ্তে সাথীদের মজবুতি বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিদিন দুই তা'লীম

প্রতিদিন দুইটি তা'লীম করা, ১টি নিজ মহল্লার মসজিদে আর একটি নিজ ঘরে।

মহল্লার মসজিদে তালিম করা

নিজ মহল্লার মসজিদে ওয়াক্ত নির্ধারণ করে যে কোন এক নামাযের পর অথবা যে ওয়াক্ত মুসল্লী বেশী বসতে পারবে, এমন এক ওয়াক্তে ফাযায়েলে আ-মলের কিতাব থেকে তা'লীম করা। তা'লীম হল মসজিদে নব্বীর আমলগুলির একটি আমল।

নিজ ঘরে তালীম

দ্বীন পুরুষের জন্য যেমন জরুরী তেমন মহিলাদের জন্যও জরুরী। অতএব কারণেই ঘরের মধ্যে তা'লীমের ব্যবস্থা করা খুবই জরুরী। ঘরের মাহরাম (যাদের সাথে দেখা জায়েয) সবাইকে নিয়ে প্রতিদিন নির্দিষ্ট এক সময়ে এই তা'লীম করবে। এর দ্বারা ঘরের মধ্যে দ্বীনের পরিবেশ কায়েম হবে। স্ত্রী, পুত্র, মেয়ে, মা-বোনদের মধ্যে দ্বীনের জেহান বলিবে। দ্বীনের উপর চলার যোগ্যতা পয়দা হবে। তা'লীমের ব্যবস্থা ঘরে চালু থাকলে অন্য কোন ফেৎনা-ফাসাদ ঘরে ঢুকতে পারবে না। নিজের ঘরে দা'ওয়াত চালু রাখা খুবই জরুরী না হয় অন্য দা'ওয়াত চালু হয়ে যাবে। যদি ঘরের মধ্যে শিক্ষিত কেহ না থাকে তাহলে মসজিদ থেকে যা শুনেছেন তাই ঘরে এসে মা, বোন, মেয়েদের শোনায়ে দিতে হবে।

রোজানা আড়াই ঘন্টা থেকে আট ঘন্টা পর্যন্ত দা'ওয়াতী মেহ্নত কি ও কেন?

প্রতিদিন আড়াই ঘন্টা থেকে আট ঘন্টার সময় নিয়ে মহল্লার প্রত্যেক অলিতে-গলিতে ঘরে ঘরে, দ্বারে দ্বারে, বার-বার যাওয়া। কেহ যদি আড়াই ঘন্টা সময় এক সাথে লাগাতে না পারে তাহলে কয়েকবারে আড়াই ঘন্টা পুরা করবে, কেহ যদি কয়েকবারেও আড়াই ঘন্টা পুরা করতে না পারে, তাহলে সে ২৪ ঘন্টায় যতটুকু সময় লাগাতে পারে ততটুকু সময়ই লাগাবে। তবে এটা দা'ওয়াতের সবচেয়ে নিম্নস্তর।

আড়াই থেকে আট ঘন্টা সময় কোন কাজে ব্যয় করব?

এ সময়ে পরামর্শ করা, পরামর্শের পর পুরাতন সাথীদের সাথে দেখা করা, খোঁজ খবর রাখা। নতুন সাথীদের সাথে সাক্ষাৎ করা। মহল্লার মসজিদে জামা'আত আসলে তাদের খোঁজ খবর নেয়া। মহল্লার কেহ জামা'আতে বের

হলে তার ব্যাপারে খোঁজ খবর নেয়া। মাকামী গাশ্‌ত থেকে নগদ জামা'আত বের করার জন্য চেষ্টা করা ইত্যাদি।

রোজানা পরামর্শ করা

দৈনিক যে কোন নামাযের পর সমস্ত মুসল্লিদেরকে নিয়ে দ্বীন জিন্দা করার উদ্দেশ্যে সমস্ত দুনিয়াকে সামনে রাখিয়া বিশেষ করিয়া নিজ দেশ, নিজ এলাকা/ মহল্লা বা গ্রামকে টার্গেট বানাইয়া চিন্তা ফিকির করা, এটার নামই রোজানা পরামর্শ। অল্প সময়ের জন্য হলেও রোজানা পরামর্শ করা চাই। পরামর্শে কেহ বসুক বা না বসুক, আমি বসাবোই (ইন্‌শাআল্লাহ)। যদি কেহ নাও বসে তবে নিজে একা একা মসজিদের পিলার/খুঁটিকে সামনে নিয়া পরামর্শে বসে যাবো। ইনশাআল্লাহ একজনের ফিকিরেই পুরা মহল্লা ফিকিরবান হয়ে যাবে। পুরা মহল্লার সাথীরা পরামর্শ করনেওয়ালা হয়ে যাবে।

মেহনতের তরীকা

মনে করেন মহল্লা/গ্রামে ৩০০টি ঘর আছে। নিজেরা একটি লিস্ট তৈরী করুন এবং নম্বর বসান, অতঃপর সাথীদের চারটা ভাগ করুন। একেক ভাগে ৭৫টি ঘর দিয়ে দেন। আর রাস্তা বা গোলি নির্ধারিত করে দিন। ১ম গ্রুপে ১-৭৫ নম্বর ঘর দিয়ে দিন, ২য় গ্রুপে ৭৬-১৫০ পর্যন্ত, ৩য় গ্রুপে ১৫১-২২৫ পর্যন্ত, ৪র্থ গ্রুপে ২২৬-৩০০ পর্যন্ত মেহনত করবে (ইনশাআল্লাহ)।

দাওয়াতে তাবলীগের কাজে সর্বদা জুড়ে থাকার মত সতেরটি পয়েন্ট

১. যে কেহ দিলের একিনের সাথে এ কাম করবে সে জমবে।

২. যে রোজানা দাওয়াত দিতে থাকবে তার জজবা বনতে থাকবে, যে দৈনিক দাওয়াত দিবে না তার জজবা কমতে থাকবে।

৩. যে পরিবেশের মধ্যে থাকবে সে জমবে যে পরিবেশ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে সে কেটে পড়বে।

৪. যে এ কাজের বাধা সৃষ্টি করবে সে কেটে পড়বে।

৫. আমীরের অনুগত ও পরামর্শের পাবন্দ ব্যক্তি জমবে।

৬. যে কারো দোষ দেখবে সে কেটে পড়বে, যে ভালাই দেখবে সে জমবে।

৭. যে তাওয়াজু এখতিয়ার করবে সে জমবে তাকাব্বরের সহিত চলনেওয়ালা জমতে পারবেনা।

৮. কোন কোন গুনাহের কারণে কাজ হতে মাহরুম (বঞ্চিত) হয়ে যায় (গীবত, অপরের দোষ তালাশ করা, (গরজ) মনচাহী বদনজরী, (শাহওয়াত)

৯. যে নাদামাত, তওবা ও এস্তেগফারের সহিত চলব সে জমবে।

১০. যে অন্যের ত্রুটি নিজের উপর নিবে সে জমবে। যে ত্রুটি অন্যের উপর চালাবে সে জমতে পারবেনা।

১১. হুজুর (সঃ) -এর সহিত মোনাফেক চলেছে কিন্তু ফায়দা হয় নাই এমনকি ঈমানও নছীব হয় নাই।

১২. যে অন্যের অন্যায় বিষয়ের ভাল মানের দিকে ব্যাখ্যা করে সে জমবে যে সব কথাই উল্টা মতলবের দিকে নিবে সে কখনও জমতে পারবে না।

১৩. যে লোক আল্লাহকে ভয় করে ও আল্লাহর কাছে চাইতে থাকে সে জমবে, জমার জন্য আল্লাহর কাছে চাইতে হবে, নতুবা পড়ে যাবে, হুজুর (সঃ) ও এস্তেকামাতের জন্য দোয়া করতেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও এরূপ দোয়া করতেন " হে আল্লাহ আমাকে মূর্তি পূঁজা হতে বাঁচাও"। অথচ উনার দ্বারা মূর্তি পূঁজার সম্ভাবনাও ছিল না। উনারা চাইছেন আর আমাদের তো কথাই নেই।

১৪. যে এখলাছের সাথে কোরবানী দেবে, আল্লাহ তাকে হর হালাতে মজবুত রাখবেন এবং ঐ সব অবস্থায়ও উচু মর্যাদা নছীব করবেন, যখন লোকদের কদম নড়ে যাবে।

১৫. যে এটা বলবে আমার উছিলায় কাম হচ্ছে সে বঞ্চিত হবে যার সম্পর্কে মানুষ মনে করবে তার উছিলায় কাম হচ্ছে, আল্লাহ তাকে উঠিয়ে নেবেন।

১৬. হযরতজী (রহঃ) বলতেন যে নকলের উপর আছার খায় সে আসলের উপর কি করে জমবে! আমরা তো নকল করনেওয়ালা।

১৭. যে পুরা উম্মতের ব্যাথা নিয়ে চলবে তার দিলের অবস্থার আছর আল্লাহ তায়ালা পুরা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেবেন।

মাসনূন দোয়াসমূহ

নতুন চাঁদ দেখিয়া পড়িবার দোয়া

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ هٰذَ الْغَاسِقِ ۔

উচ্চারণ ঃ আউ'যুবিল্লাহি মিং শাররি হাজাল্ গাসিক্বি।

ক্বদরের রাত্রিতে পড়িবার দোয়া'

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আ'ফুয়্যুন তুহিববুল্ আ'ফ্ওয়া ফা'ফু আ'ন্নী।

আয়নায় মুখ দেখিবারকালে পড়িবার দোয়া'

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্তা হাস্সান্তা খাল্ক্বী ফাহাস্সিন্ খুলুক্বী।

মুসলমান ভাইকে সালাম দেওয়া

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ۔

উচ্চারণ ঃ আচ্ছালামু আ'লাইকুম ওয়া রহ্মাতুল্লাহি ওয়া-বারাকাতুহু।

সালামের জওয়াব দেওয়া

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ۔

উচ্চারণ ঃ ওয়া আ'লাইকুমুস্ সালামু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

হাঁচির দোয়া

কেহ হাঁচি দিলে বলিবে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদু লিল্লাহি)

হাঁচি শুনিয়া বলিবে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ (ইয়ারহামুকাল্লাহু)

ঋণ পরিশোধের দোয়া'

কোন লোক ঋণগ্রস্ত হইয়া আদায়ের ব্যবস্থা না থাকিলে এই দোয়া' পড়িতে থাকিলে আল্লাহ তা'আলা ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাক্ফিনী বিহালা-লিকা আ'ন্ হারামিকা ওয়াগ্নিনী বিফাদ্লিকা আ'ম্মান্ সিওয়াকা।

সকাল সন্ধ্যার দোয়া' সমূহ

প্রত্যহ ফজরের পরে এবং মাগরিবের পরে এই দোয়া' তিনবার পাঠ করিবে—

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۔

উচ্চারণ ঃ বিস্মিল্লাহিল্লাযী লা-ইয়াদুর্রু মায়া' ইসমিহী শাইউন্ ফিল্ আরদ্বি ওয়া লা-ফিচ্ছামা—য়ি ওয়া হুওয়াছ সামীউ'ল্ আ'লীম।

উপকারিতা ঃ যে ব্যক্তি ফজর ও মাগরিবের পরে এই দোয়া' তিনবার পাঠ করিবে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে আকস্মিক মুছীবত হইতে রক্ষা করিবেন।

অতঃপর সূরা হাশরের এই তিন আয়াত পাঠ করিবে ঃ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۔ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۔ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۔ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۔

উচ্চারণ ঃ হুওয়াল্লাহুল্লাযী লা-ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া ; আ'-লিমুল্ গাইবি ওয়াশ্ শাহা-দাতি হুওয়ার্ রহমানুর রহীম। হুওয়াল্লাহুল্লাযী লা-ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া ; আল্ মালিকুল্ কুদ্দু-সুস, সালামুল্ মু'মিনুল্ মুহাইমিনুল্ আ'যী-যুল্ জব্বারুল্ মুতাকাব্বির। সুব্হানাল্লাহি আ'ম্মা ইয়ুশ্রিকূ-ন। হুওয়াল্লাহুল্ খালিকুল্ বা-রিউল মুছাওবিরু লাহুল্ আসমা—উল্হুস্না— ; ইয়ুসাব্বিহু লাহূ মা-ফিস্সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ; ওয়া হুওয়াল আ'যী-যুল হাকী-ম।

উপকারিতা ঃ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি উপরোক্ত দোয়া' সকালে পাঠ করিবে, আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা নির্ধারিত করিয়া দেন, যাহারা তাহার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত রহমতের প্রার্থনা করিতে থাকেন। আর যদি ঐ ব্যক্তি সেই দিন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে সে শহীদি মৃত্যু

লাভ করিবে। এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এই দোয়া' পাঠ করিবে, আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা নির্ধারিত করিয়া দেন, যাহারা, তাহার জন্য ফজর পর্যন্ত রহমতের প্রার্থনা করিতে থাকে, আর যদি সে ঐ রাত্রিতে মৃত্যুবরণ করে, তবে সে শহীদি মৃত্যু লাভ করিবে।

আয়াতুল কুরসীর ফযীলত

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি সকালবেলা আয়াতুল কুরসী পাঠ করিবে, সে ব্যক্তি ইহার বরকতে সন্ধ্যা পর্যন্ত যাবতীয় বিপদাপদ ও অপ্রীতিকর অবস্থা হইতে মাহফুজ থাকিবে। এবং যে ব্যক্তি ইহা সন্ধ্যায় পাঠ করিবে, সে ব্যক্তি সকাল পর্যন্ত নিরাপদে শান্তিতে থাকিবে।

আয়াতুল কুরসী এই

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ج لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ط لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ط يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ج وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ج وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল্ ক্বাইয়্যুম, লা- তা'খুযুহু সিনাতুওঁ ওয়া লা নাওম্। লাহূ মা ফিচ্ছামা-ওয়াতি ওয়ামা-ফিল্আরদ্বি। মাং যাল্লাযী ইয়াশ্ফাউ' ই'ন্দাহূ ইল্লা বিইযনিহী, ইয়া'লামু মা-বাইনা আইদী-হিম্ ওয়া মা- খাল্ফাহুম; ওয়া লা- ইয়ুহী-তূ-না বিশাইয়িম্ মিন্ ই'লমিহী- ইল্লা- বিমা- শা-য়া ওয়াসিয়া' কুরসিয়্যুহুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বা ; ওয়া লা- ইয়াউদুহূ হিফযুহুমা, ওয়া হুওয়াল্ আ'লিয়্যুল আ'যী-ম।

শয়তান হইতে বাঁচিয়া থাকিবার দোয়া'

নিচের দোয়া' সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, এই দোয়া সকালবেলা পাঠ করিলে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং সন্ধ্যায় পাঠ করিলে সকাল পর্যন্ত শয়তানের চক্রান্ত হইতে বাঁচিয়া থাকিবে।

দোয়া'টি এই ঃ

رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَّ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا ـ

উচ্চারণ ঃ রাদ্বী-না বিল্লাহি রব্বাওঁ ওয়া বিল্ ইস্লামি দ্বীনাওঁ ওয়া বিমুহাম্মাদিন্ সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামা নাবিয়্যান্।

বিপদ মুক্তির বিশেষ দোয়া'

বর্ণিত আছে, বিপদ দেখা দিলে, তখন সিজদায় যাইয়া নিম্নের দোয়াটি পাঠ করিলে বিশেষ উপকার হইবে। হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বদরের যুদ্ধের সময় এই দোয়া' সিজদার মধ্যে পাঠ করিয়াছিলেন। এবং এই দোয়া'র বরকতে তাঁহাকে বদর যুদ্ধে বিজয় প্রদান করিয়াছিলেন। **দোয়া'টি এই ঃ**

يَاحَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ ـ اَصْلِحْ لِىْ شَاْنِىْ كُلَّهٗ وَلَا تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ ـ

উচ্চারণ ঃ ইয়া হাইয়্যু ইয়া "ক্বাইয়্যুমু বিরহমাতিকা আস্তাগীছু ; আছলিহ্ লী-শা'নী কুল্লাহূ ওয়ালা-তাকিলনী-ইলা-নাফসী-ত্বারফাতা আ'ইনিন্।

গুনাহ্ মা'ফীর দোয়া

বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি এই দোয়া' সকালে ও সন্ধ্যায় ১০ বার করিয়া পাঠ করিবে, আল্লাহ তা'আলা তাহার আ'মল নামায় ১০০ নেকী লিখিবেন, এবং ১০০ বদী মিটাইয়া দিবেন আর একটি গোলাম আজাদ করিবার পূণ্য লাভ করিবে। আর উক্ত দিবসে ও রাত্রিতে সমস্ত বিপদাপদ হইতে নিরাপদে থাকিবে।

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ـ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ـ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা-শারীকা লাহূ ; লাহুল্ মুল্কু ওয়া লাহুল্ হাম্দু ; ওয়া হুওয়া আ'লা-কুল্লি শায়ই'ন্ ক্বাদী-র।

দ্রষ্টব্য ঃ কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায়, এই দোয়া পাঠ করিলে, ২০ লক্ষ নেকী পাওয়া যাইবে।

ঋণ পরিশোধ হইবার দোয়া

বর্ণিত আছে, এই দোয়া' রীতিমত পাঠ করিলে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ

হইবার ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলা করিয়া দিবেন এবং সকল দুশ্চিন্তা দূর করিয়া নিশ্চিন্ত করিয়া দিবেন। **দোয়া'টি এই—**

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ . وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ . وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা মিনাল্ হাম্মি ওয়াল হুযনি ; ওয়া আউ'যুবিকা মিনাল্ আ'জযি ওয়াল্ কাসালি, ওয়া আউ'যুবিকা মিন্ গালাবাতিদ্ দাইনি ওয়া কাহ্‌রির রিজা-লি।

প্রয়োজন মিটাইবার দোয়া'

বর্ণিত আছে, একদা হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত সালমান (রাঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া এরশাদ করিলেন, হে সালমান! দিন রাত্রিতে যখনই সুযোগ পাইবে, তখন এই দোয়া'টি অবশ্যই পাঠ করিবে এবং নিজের প্রয়োজনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দোয়া' প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা মিটাইয়া দিবেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ صِحَّةً فِىْ اِيْمَانٍ . وَاِيْمَانًا فِىْ حُسْنِ خُلُقٍ وَّنَجَاةً يَتْبَعُهَا فَلَاحٌ . وَرَحْمَةً مِّنْكَ وَعَافِيَةً وَّمَغْفِرَةً . وَمَغْفِرَةً مِنْكَ وَرِضْوَانًا .

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী—আস্‌য়ালুকা ছিহ্‌হাতান্ ফী-ঈমা-নিন্। ওয়া ঈমা-নান্ ফী-হুস্‌নি খুলুকিঁও ওয়া নাজাতাইঁ ইয়াত্‌বাউ'হা—ফালাহুন্। ওয়া রহ্‌মাতাম্ মিংকা ওয়া আ'ফিয়াতান্ ওয়া মাগ্‌ফিরাতান্ ওয়া মাগ্‌ফিরাতাম মিন্‌কা ওয়া রিদ্বওয়ানান্।

শয়নকালের দোয়া'

হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন—শয়নের পূর্বে অজু না থাকিলে অজু করতঃ শয়ন করিবে। শুইবার পূর্বে যেকোন কাপড় দ্বারা বিছানা তিনবার ঝাড়িয়া লইবে। অতঃপর এই দোয়া পাঠ করিয়া বিছানায় শয়ন করিবে। **দোয়া'টি এই ঃ**

لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ . لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ . لَا حَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ . سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ .

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহূ লা-শারীকা লাহূ। লাহুল্ মুল্‌কু ওয়া লাহুল্ হাম্‌দু ওয়া হুওয়া আ'লা কুল্লি শায়ই'ন্ ক্বাদীর। লা-হাওলা ওয়া লা-কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহি। সুব্‌হানাল্লাহি ওয়াল্ হাম্‌দু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।

ঈমানের সহিত ইসলামের উপর মৃত্যু হইবার দোয়া'

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِىَ اِلَيْكَ . وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ . وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ . رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ . لَامَلْجَاءَ وَلَامَنْجَاءَ مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ . اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ .

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি, আল্লাহুম্মা আসলামতু নাফ্‌সী ইলাইকা ওয়া ওয়াজজাহ্‌তু ওয়াজ্‌হী ইলাইকা ওয়া ফাওয়াদ্‌তু আমরী ইলাইকা। ওয়া আলাজা'তু জাহ্‌রী ইলাইকা রগাবাতান্ ওয়া রহবাতীন্ ইলাইকা। লা-মাল্‌জায়া ওয়া লা-মান্‌জায়া মিনকা ইল্লা ইলাইকা। আ-মান্‌তু বিকিতা- বিকাল্লাযী—আংযাল্‌তা ওয়া নাবিয়্যিকাল্লাযী আরসাল্‌তা।

খারাপ স্বপ্ন দেখিয়া পড়িবার দোয়া

বর্ণিত আছে, খারাপ স্বপ্ন দেখিয়া বাম পার্শে তিনবার থু থু ফেলিবে এবং যেই পার্শে শোয়া ছিলে ঐ পার্শ পরিবর্তন করিয়া শুইবে আর এই দোয়া' তিনবার পাঠ করিবে এবং কাহারো নিকট বলিবে না। **দোয়া এই ঃ**

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَشَرِّ هٰذِهِ الرُّؤْيَا .

উচ্চারণ ঃ আউ'যুবিল্লাহি মিনাশ্‌শাইত্বানির্ রাজীমি ওয়া শাররি হাযিহির্ রু'ইয়া।

খারাপ স্বপ্ন দেখিয়া ভয় পাইলে পড়িবার দোয়া

হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আ'স (রাঃ) এর অভ্যাস ছিল তিনি এই দোয়াটি তাঁহার বয়স্ক সন্তানদিগকে শিখাইতেন এবং নাবালেগ সন্তানদের জন্য ইহা লিখিয়া গলায় বাঁধিয়া দিতেন।

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنَ .

উচ্চারণ ঃ আউ'যু বিকালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতি মিং গাদাবিহী ওয়া ই'ক্বা-বিহী ওয়া শার্‌রি ই'বাদিহী— ওয়ামিন্ হামাযাতিশ্ শাইয়াত্বীনি ওয়া আইঁয়্যাহ্‌দুরু-ন।

নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া পড়িবার দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ۔

উচ্চারণ ঃ আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাযী আহ্‌ইয়া-না- বা'দা মা আমাতানা- ওয়া ইলাইহিন্ নুশু-র।

খানা খাওয়ার পরের দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۔

উচ্চারণ ঃ আলহাম্‌দু লিল্লাহিল্লাযী আত্বা'মানা ওয়া সাক্বা-না ওয়া জায়া'লানা মিনাল মুসলিমীন।

দাওয়াত খাইবার পরে দোয়া'

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِىْ وَاَسْقِ مَنْ سَقَانِىْ ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আত্বয়ি'ম্ মান্ আত্বয়া'মানী, ওয়াস্‌ক্বি মান্ সাক্বা-নী।

নতুন পোশাক পরিধানকালে দোয়া'

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا اُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ وَ اَتَجَمَّلُ بِهٖ فِىْ حَيَاتِىْ ۔

উচ্চারণ ঃ আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাযী-কাসানী মা উওয়ারিয়া বিহী আ'ওরাতী ওয়া আতাজাম্মালু বিহী-ফী-হায়াতী।

নতুন সওয়ারীতে চড়িবারকালে দোয়া'

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَاجَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী—আস্‌য়ালুকা খাইরুহা ওয়া খাইরি মা জাবাল্‌তাহা আ'লাইহি ওয়া আউ'যুবিকা মিন্ শার্‌রিহা ওয়া শার্‌রি মা-জাবালতাহা আ'লাইহি।

স্ত্রী সহবাসকালে দোয়া'

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا ۔

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিব্‌নাশ শাইত্বানা ওয়া জান্নিবিশ্ শাইত্বানা মা-রযাক্বতানা।

বীর্যপাতকালে দোয়া'

اَللّٰهُمَّ لَاتَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيْمَا رَزَقْتَنِىْ نَصِيْبًا ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লা-তাজয়া'ল লিশ্‌শাইত্বানি ফী-মা রাযাক্বতানী নাছী-বা।

যানবাহনে আরোহনকালে পড়িবার দোয়া'

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ۔

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাযী সাখ্‌খারা লানা হা-যা ওয়া মা-কুন্না লাহূ মুক্বরিনীনা ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুনক্বালি বূ-ন।

সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পড়িবার দোয়া'

اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ ۔

উচ্চারণ ঃ আ-য়ি বূনা তা-য়িবূ-না আবিদূ-না লিরব্বনা-হা-মিদূ-না

নৌকা বা জাহাজে আরোহণকালের দোয়া'

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۔ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۔ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ ۔ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۔

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি মাজ্‌রেহা- ওয়া মুরসা-হা-ইন্না রব্বী লাগফূরুর রহীম। ওয়া মা-ক্বাদারুল্লাহা হাক্কা ক্বাদরিহী, ওয়াল্ আরদ্বু জামী-আ'ন্ ক্বব্‌দাতুহূ ইয়াওমাল্ ক্বিয়ামাতি ওয়াচ্ছামাওয়া-তু মাত্বিয়্যা-তুম্ বিইয়ামী-নিহী ; সুব্‌হা-নাল্লাহি ওয়া তা'আলা আ'ম্মা ইয়ুশ্‌রিকূ-ন।

গৃহে প্রবেশকালে পড়িবার দোয়া'

تَوْبًا تَوْبًا ـ لِرَبِّنَا اَوْبًا ـ لَايُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا ـ

উচ্চারণ ঃ তাওবান্, তাওবান্, লিরব্বিনা আওবান্, লা-ইয়ুগাদিরু আ'লাইনা হাওবান্।

বিশ লাখ নেকীর দোয়া

لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ وَحْدَهٗ لَا شَـرِيْكَ لَـهٗ اَحَـدًا صَمَدًا لَـمْ يَلِـدْ وَلَـمْ يُـوْلَدْ ـ وَلَـمْ يَـكُـنْ لَـهٗ كُـفُـوًا اَحَـدٌ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারীকা-লাহু আহাদান সামাদান লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ, ওয়ালাম ইয়াকুল লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

বাজারে যাইবার কালে পড়িবার দোয়া'

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ ـ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ ـ وَهُوَ حَىٌّ لَايَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ ـ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকা লাহু; লাহুল্ মুলকু ওয়া লাহুল্ হাম্দু ইয়ুহ্য়ী ওয়া ইয়ামীতু ওয়া হুওয়া হাইয়ুল্লাইয়ামূতু বিয়াদিহিল খাইরু ওয়া হুওয়া আ'লা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِنَا ـ وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مُدِّنَا ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফী ছামারিনা ; ওয়া বারিক লানা ফী মাদীনাতিনা, ওয়া বারিক লানা ফী ছায়ি'না; ওয়া বারিক লানা ফী-মুদ্দিনা।

বিপদে বা রোগাক্রান্ত দেখিলে পড়িবার দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ ـ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا ـ

উচ্চারণ ঃ আলহাম্দু লিল্লাহিল্লাযী আ'ফানী মিম্মাব্ তালাকা বিহী; ওয়া ফাদ্দালানী আ'লা কাছীরিম্ মিম্মান খলাক্বা তাফ্দ্বী-লা।

ঈমানে মুজমাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَاهُوَبِاَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ وَاَرْكَانِهٖ

উচ্চারণ ঃ আ-মান্তু বিল্লাহি কামা-হুওয়া বিআস্মা-য়িহী-ওয়া ছিফা-তিহী-ওয়া ক্বাবিল্তু জামী-য়া' আহকামিহী ওয়া আরকা-নিহী।

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর প্রতি ও তাঁহার যাবতীয় নাম সমূহ ও গুণাবলীর প্রতি যথাযথভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম এবং তাঁহার সব প্রকার আদেশ- নির্দেশ ও বিধান সমূহ মানিয়া লইলাম।

কালেমায়ে তাইয়্যেব لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু- মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

অর্থ ঃ "আল্লাহ বতীত অন্য কেহ উপাস্য নাই, মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল।"

কালেমায়ে শাহাদত

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

উচ্চারণ ঃ আশ্হাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহূ লা-শারী-কালাহূ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মদান আব'দুহূ ওয়া রাসূ-লুহূ।

অর্থ ঃ "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহই উপাস্য নাই, তিনি অদ্বিতীয়, তাঁহার কোন শরীক নাই, এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।"

কালেমায়ে তাওহীদ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَاحِدًا لَا ثَانِىَ لَكَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলা-হা ইল্লা আন্তা ওয়াহিদাল্লা-ছা-নিয়ালাকা মুহাম্মাদুর্ রাসূলুল্লা-হি ইমা-মুল্ মুত্তাক্বী-না রাসূলু রব্বিল আ-লামী-ন।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ্ ! তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কেহই নাই, তুমি এক ও শরীকবিহীন। হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) মুত্তাক্বীগণের নেতা ও বিশ্ব প্রতিপালকের রাসূল।

কালেমায়ে তামজীদ

لَآاِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ نُوْرًا يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمُ النَّبِيّٖنَ -

উচ্চারণ ঃ লা-ইলা-হা ইল্লা আন্‌তা নূরাইঁইয়াহ্ দিয়াল্লা-হু লিনূরিহী। মাইয়্যাঁশা-উ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লা-হি ইমামুল মুরসালী-না খাতামুন্ নাবিয়্যী-ন।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য অন্য কেহই নাই। তুমি জ্যোতির্ময় আল্লাহ্, তুমি যাহাকে ইচ্ছা তোমার স্বীয় জ্যোতি দ্বারা পথ প্রদর্শন করিয়া থাক, হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) রাসূলগণের নেতা ও আখেরী নবী।

ইসলামের প্রথম স্তম্ভ সম্পর্কে আলোচনা করা হইল। এখন ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ নামায সম্পর্কে আলোচনা করিব। তবে ইহার পূর্বে নামাযের প্রয়োজনীয় কতক বিষয়ের আলোচনা করা দরকার। যেমন, অজু গোছল, পাক পবিত্রতা, আযান, ইকামাত ইত্যাদি।

অজুর ফরজ ঃ অজুর মধ্যে চারটি ফরজ। যথা ঃ (১) সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল একবার ধৌত করা। (২) উভয় হাত কনুইসহ একবার ধৌত করা। (৩) মাথার এক চতুর্থাংশ একবার মোছেহ করা। (৪) উভয় পা টাখনুসহ একবার ধৌত করা। এই ফরজ সমূহের মধ্য হইতে একটি কার্যও বাদ পড়িলে কিংবা একটি পশমের গোড়ায়ও পানি না পৌঁছিলে অর্থাৎ শুকনা থাকিলে অজু হইবে না।

অজু ভঙ্গ হইবার কারণ সমূহ

(১) প্রস্রাব ও পায়খানার দ্বার দিয়া কোন বস্তু বাহির হওয়া, যথা ঃ প্রস্রাব করা, মল ত্যাগ করা, কৃমি, বায়ু, পুঁজ ইত্যাদি বাহির হওয়া। (২) মুখ ভর্তি বমি করা। (৩) দেহের যে কোন ক্ষত স্থান হইতে রক্ত, পুঁজ বা পানি বাহির হইয়া গড়াইয়া যাওয়া। (৪) উচ্চ আওয়াজে নামাযের মধ্যে হাসিলে। (৫) নেশা জাতীয় কোন কিছু খাইয়া বেহুশ বা পাগল হইলে। (৬) দাঁতের গোসা কিংবা মুখের অন্য কোন স্থান হইতে রক্ত বাহির হইলে (৮) উলঙ্গ অবস্থায় নারী ও পুরুষের লিঙ্গ একত্রিত হইলে। (৯) তাইয়্যাম্মুমকারী পানি প্রাপ্ত হইয়া অজু করিতে সক্ষম হইলে। (১০) নিদ্রামগ্ন হইলে, (১১) বেহুশ হইলেও অজু নষ্ট হইয়া যায়।

অজু করিবার দোয়

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ - وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ - اَلْاِسْلَامُ حَقٌّ وَالْكُفْرُ بَاطِلٌ - اَلْاِسْلَامُ نُوْرٌ وَ الْكُفْرُ ظُلْمَةٌ -

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহিল্ আ'লিয়্যিল আযীমি, ওয়াল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি আ'লা দ্বীনিল ইসলামি, আল ইসলামু হাক্কুন্ ওয়াল কুফ্‌রু বাত্বিলুন। আল ইস্‌লামু নূরুন্ ওয়াল্ কুফরু যুল্‌মাতুন্।

অজু শেষ করিয়া পরিবার দোয়া'

আল্লাহুম্মাজ আ'ল্‌নী মিনাত্তাওয়্যাবীনা ওয়াজ আ'ল্‌নী মিনাল্ মুতাত্বাহ্‌হিরীনা ওয়াল্লাজিনা লা-খাওফুন আ'লাইহিম ওয়ালা হুম্ ইয়াহ্‌যানূন।

তাইয়্যাম্মুমের ফরজ

(১) তাইয়্যাম্মুমের নিয়াত করা। (২) তাইয়্যাম্মুমের বস্তুর উপর হস্তদ্বয় মারিয়া উহা ঘর্ষণ করতঃ সমস্ত মুখমণ্ডল একবার মাসেহ করা, (৩) তৎপর হস্তদ্বয় পুনঃ তাইয়্যাম্মুমের বস্তুতে মারিয়া ঘর্ষণ করতঃ প্রথমে বাম হস্তের তিনটি অঙ্গুলী দ্বারা (কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা) ডান হস্তের পৃষ্ঠদেশ অঙ্গুলীর মাথা হইতে কনুই পর্যন্ত মাসেহ করিয়া অতঃপর বাম হস্তের বৃদ্ধা ও শাহাদত অঙ্গুলী দ্বারা ডান হস্তের পেট কনুই হইতে অঙ্গুলীর মাথা পর্যন্ত মাসেহ করা। তৎপর ডান হস্ত দ্বারা উক্ত নিয়মে বাম হস্ত মাসেহ করা।

তাইয়্যাম্মুমের নিয়াত

নাওয়াইতু আন আতাইয়াম্মামা লিরাফ্‌য়ি'ল হাদাছি ওয়াল জানাবাতি ওয়াসতিবাহাতাল্ লিচ্ছালাতি ওয়া তাক্বাররুবান্ ইলাল্লাহি তা'আলা।

বাংলা নিয়ত ঃ আমি অপবিত্রতা হইতে পাক পবিত্র হইবার জন্য এবং নামায আদায় ও আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যতা লাভের জন্য তাইয়্যাম্মুম করিতেছি।

গোসলের বিবরণ

মানব দেহের নাপাকি ও ময়লাসমূহ দূর করিবার জন্য এবং স্বাস্থ্যরক্ষা ও শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য গোসল করা একান্ত প্রয়োজন। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাও গোসল করিতে আদেশ করিয়াছেন। গোসল চার প্রকার, যথা ঃ (১) ফরজ গোসল, (২) ওয়াজিব গোসল, (৩) সুন্নাত গোসল এবং (৪) মুস্তাহাব গোসল।

ফরজ গোসল

(১) যে কোন কারণে উত্তেজনা বশতঃ বীর্য (ধাতু) নির্গত হইলে, (২) স্বপ্ন দোষ হইলে, (৩) স্বামী ও স্ত্রী সহবাস করিলে, এই তিন অবস্থায় স্ত্রী লোক ও পুরুষ লোকের গোসল করা ফরজ এবং (৪) স্ত্রী লোকদের জন্য হায়েজ ও নেফাসের পরে গোসল করা ফরজ।

ওয়াজিব গোসল

(১) কোন কাফের লোক জানাবাত অবস্থায় মুসলমান হইলে তাহার জন্য গোসল করা ওয়াজিব হইবে। (২) মুর্দা ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া ওয়াজিব, তবে কোন কোন আলেম ফরজে কেফায়া বলিয়াছেন। মুর্দারের গোসল দাতাও গোসল করা ওয়াজিব কিন্তু কোন কোন আলেম ইহাকে সুন্নাত বলিয়াছেন।

গোসলের ফরজ

গোসলের মধ্যে তিনটি ফরজ, যথা ঃ (১) গড়গড়ার সহিত কুলী করা, কিন্তু রোজা রাখাবস্থায় গড়গড়া করা নিষেধ। (২) নাকের ভিতরের নরম স্থান পর্যন্ত পানি পৌছাইয়া উত্তমরূপে নাক পরিষ্কার করা, (৩) মাথা হইতে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীরে পানি পৌছাইয়া ধৌত করা। উপরোক্ত তিনটি ফরজ কার্যের মধ্যে একটিও ছুটিয়া গেলে কিংবা শরীরের একটি পশমের গোসালী শুকনা থাকিলে গোসল শুদ্ধ হইবে না।

এস্তেঞ্জার বিবরণ

প্রস্রাব ও মল ত্যাগের পরে পবিত্র হওয়াকে এস্তেঞ্জা বলা হয়। এই এস্তেঞ্জা দুই প্রকার, যথা ঃ (১) বড় এস্তেঞ্জা ও (২) ছোট এস্তেঞ্জা। মলত্যাগের পরে পবিত্র হওয়াকে বড় এস্তেঞ্জা বলা হয়। এই প্রস্রাব ও মল ত্যাগ করিবার পর পবিত্রতা করা সুন্নাত।

পায়খানার পূর্বের দোয়া

আল্লাহুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা মিনাল্ খুবুছি ওয়াল্ খাবায়িছি।

পায়খানার পরের দোয়া

আল্হামদু লিল্লাহিল্লাযী আয্হাবা আ'ন্নিল্ আযা ওয়া আফানী।

আযানের কালাম সমূহ اَللهُ اَكْبَرُ ـ اَللهُ اَكْبَرُ

"আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আক্‌বার" (দুইবার)

অর্থ ঃ আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান।

অতঃপর বলিবে ঃ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ـ

"আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" (দুইবার)

অর্থ ঃ অমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই।

অতঃপর বলিবে ঃ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ ـ

"আশহাদুআন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" (দুইবার)

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল।

অতঃপর ডান দিকে শুধু মুখমণ্ডল ফিরাইয়া বলিবে ঃ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ـ

"হাইয়্যা আ'লাচ্ছালাহ্" (দুইবার) **অর্থ ঃ** নামাযের জন্য আসুন।

অতঃপর বাম দিকে শুধু মুখমণ্ডল ঘুরাইয়া বলিবে ঃ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

"হাইয়্যা আ'লাল্ ফালাহ্" (দুইবার)

অর্থ ঃ নেক কাজের জন্য আসুন।

অতঃপর শুধু ফজরের আযানে বলিতে হইবে ঃ

اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ

" আচ্ছালাতু খাইরুম্ মিনান্নাওম্" (দুইবার)

অর্থ ঃ নামায নিদ্রা হইতে উত্তম।

অতঃপর বলিবে ঃ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ

"আল্লাহু আকবার আল্লাহু আক্‌বার" (একবার)

অর্থ ঃ আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান।

অতঃপর বলিবে ঃ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" (একবার)

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ মা'বুদ নাই।

আযানের দোয়া'

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَتِ التَّامَّةِ ـ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ ـ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَهُ ـ اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রব্বা হাযিহিদ্ দা'ওয়াতিত্ তাম্মাতি, ওয়াচ্ছলাতিল্ ক্বায়িমাতি আতি সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিনিল্ ওয়াছীলাতা ওয়াল্ ফাযীলাতা ওয়াদ্দারাজাতার্ রাফীআ'হ্, ওয়াব্‌আ'ছ্‌হু মাক্বামাম্ মাহমূদানিল্লাযী ওয়াআ'দ্‌তাহ্, ইন্নাকা লা-তুখলিফুল্ মীআ'দ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! তুমি এই পরিপূর্ণ আহ্বানের ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে উসীলা এবং সমস্ত সৃষ্টির মাঝে মর্যাদা দান কর এবং তাঁহাকে ঐ প্রশংসিত স্থান দান কর যাহা তাহার জন্য তুমি ওয়াদাহ্ করিয়াছ। নিশ্চয়ই তুমি ভঙ্গ কর না অঙ্গিকার।

নামাযের ফরজসমূহ

নামাযের বাহিরে ও ভিতরে মোট ১৩টি ফরজ। নামাযের বাহিরে মোট ৭টি ফরজ, ইহাকে নামাযের আহকাম বলা হয়। যথা ঃ (১) শরীর পাক হওয়া, (২) পরিধানের কাপড় পাক হওয়া, (৩) নামাযের জায়গা পাক হওয়া, (৪) সতর ঢাকা অর্থাৎ বস্ত্রাবৃত করিয়া নামায পড়া। (৫) কেবলামুখী হইয়া নামায পড়া, (৬) ওয়াক্ত মত নামায পড়া এবং (৭) নামাযের নিয়াত করা।

নামাযের ভিতরে ৬টি ফরজ

ইহাকে নামাযের আরকান বলা হয়। যথা ঃ (১) তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলা,

(২) কেয়াম করা, অর্থাৎ দাড়াইয়া নামায পড়া, (৩) কেরায়াত পড়া, (৪) রুকু করা, (৫) সিজদা করা, (৬) শেষ বৈঠকে বসা।

আহ্‌কাম ও আরকানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

১। শরীর পাক হওয়া ঃ নামাযের পূর্বে অজু করিতে হইবে। ফরজ গোসলের দরকার হইলে গোসল করিতে হইবে। শরীয়াত সম্মত কোন গুরুতর ওজর থাকিলে অজু ও গোসলের পরিবর্তে তাইয়াম্মুম করিতে হইবে।

২। পরিধানের কাপড় পাক হওয়া ঃ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পবিত্র কাপড় পরিধান করতঃ নামায পড়িতে হইবে। যেহেতু অপবিত্র বা নাপাক কাপড় পরিধান করিয়া নামায পড়িলে উক্ত নামায শুদ্ধ হইবে না বা আল্লাহর দরবারে কবুল হইবে না।

৩। নামাযের জায়গা পাক হওয়া ঃ যেই স্থানে দাঁড়াইয়া নামায আদায় করিতে হয়, সেই স্থানটুকু পাক-পবিত্র হইতে হইবে নতুবা নামায আদায় করা হইবে না এবং উহা আল্লাহর দরবারে কবুলও হইবে না।

৪। সতর ঢাকা বা আবৃত করা ঃ অর্থাৎ পুরুষের জন্য কমের পক্ষে হাটুর উপর হইতে পদদ্বয়ের গিরা পর্যন্ত এবং স্ত্রীলোকদের সর্ব শরীর আবৃত করিয়া নামায পড়িতে হইবে। নতুবা নামায আদায় হইবে না।

৫। ক্বেবলামুখী হইয়া নামায পড়া ঃ অর্থাৎ ক্বেবলাকে সম্মুখে রাখিয়া নামায পড়িতে হইবে। নামাযের মধ্যে ক্বেবলা সম্মুখে না থাকিলে বা ঘুরিয়া গেলে নামায আদায় হইবে না।

৬। ওয়াক্তমত নামায পড়া ঃ যেই ওয়াক্ত নামাযের জন্য যেই সময় নির্ধারিত সেই সময় সেই নামায পড়িতে হইবে। নির্ধারিত সময়ের (ওয়াক্তের) পূর্বে বা পরে নামায পড়িলে উহা আদায় হইবে না।

৭। নামাযের নিয়াত করা ঃ অর্থাৎ যেই ওয়াক্তে যেই নামায পড়িবে মনে মনে সেই ওয়াক্তের নিয়াত করিতে হইবে। আর অন্যান্য ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল নামায পড়িলে উহার কথা নিয়াতে উল্লেখ করিতে হইবে না।

নামাযের ভিতরের ফরজ সমূহ

৮। তাকবীরে তাহরীমা বলা ঃ নিয়াত করিয়া "আল্লাহু আকবার" বলিয়া নামায আরম্ভ করা। অর্থাৎ নামাযের ভিতরে দুনিয়াবী কাজকর্ম হারাম বিধায়

"আল্লাহু আকবার" বলিয়া দুনিয়াবী সমস্ত কার্যাদী ত্যাগ করতঃ আল্লাহর দরবারে হাযিরা দেওয়া। তাই এই তাকবীর বলিয়া নামায শুরু করা হয়, এই জন্য এই তাকবীরকে তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলা হয়।

৯। ক্বেয়াম করা অর্থাৎ দাঁড়াইয়া নামায পড়া ঃ ফরজ নামায সমূহ বসিয়া পড়া জায়েয নাই অতএব দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে হইবে। শরীয়াতী ওজর থাকিলে বসিয়া ফরজ নামায পড়া দুরস্ত আছে। আর সুন্নাত, মুস্তাহব ও নফল নামায প্রয়োজনবোধে বসিয়া আদায় করা জায়েয আছে।

১০। কেরা'আত পড়া ঃ অর্থাৎ কুরআন শরীফের কিছু আয়াত নামাযের মধ্যে পড়া ফরজ। সূরা ফাতিহার পরে কুরআন শরীফের যে কোন একটি সূরা অথবা বড় এক আয়াত কিংবা ছোট তিন আয়াত পড়া ফরজ।

১১। রুকু করা ঃ অর্থাৎ কোমর বাঁকা করিয়া মাথা নত করা।

১২। সিজদা করা ঃ অর্থাৎ রুকু হইতে দাঁড়াইয়া জায়নামাযের উপর নাক ও কপাল স্থাপন করা।

১৩। শেষ বৈঠকে বসা ঃ অর্থাৎ, দুই, তিন ও চার রাকয়াত বিশিষ্ট নামাযের শেষ বৈঠকে বসা ফরজ। ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল ইত্যাদি নামাযের শেষ বৈঠকে বসাও ফরজ।

নামাযে দরকারী দোয়া ও তাস্‌বীহ সমূহ

জায়নামাযে দাঁড়াইয়া পড়িবার দোয়া ঃ

إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বা হানীফাওঁ ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন।

অর্থ ঃ "যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন, নিশ্চয়ই আমি আমার মুখমণ্ডল তাঁহার দিকে ফিরাইলাম। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।"

সানা (সুব্‌হানাকা)

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعٰلٰى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

উচ্চারণ ঃ সুব্‌হানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদ্বিকা ওয়া তাবারকাস্‌মুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গায়রুক।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! তুমি পবিত্র, সকল প্রশংসা তোমার জন্যই। তোমার নাম মঙ্গলময়। তোমার মহিমা অতি উচ্চ। তুমি ভিন্ন কেহই মা'বুদ নাই।"

তায়া'ব্বুজ ('আউযু বিল্লাহ) أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণ ঃ আউ'যু বিল্লাহি মিনাশ্‌শাইত্বানির্ রযীম।

অর্থ ঃ বিতাড়িত শয়তানের প্ররোচনা হইতে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

তাসমিয়া - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম।

অর্থ ঃ পরম করুনাময় দাতা-দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি।

রুকুর তাসবীহ - سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণ ঃ সুব্‌হানা রব্বিয়াল আ'যীম।

অর্থ ঃ আমার মহিমান্বিত প্রভু পবিত্র।

তাসমী - سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ـ

উচ্চারণ ঃ সামীআ'ল্লাহুলিমান হামিদাহ্।

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে, তিনি তাহা শুনেন।

তাহ্‌মীদ - رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

উচ্চারণ ঃ রব্বানা লাকা'ল হাম্‌দ।

অর্থ ঃ আমার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু পবিত্র।

সিজদাহর তাসবীহ্ ‌- سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى ـ

উচ্চারণ ঃ সুব্হানা রব্বিয়াল আ'লা।

অর্থ ঃ আল্লাহ অতি বড় ও পবিত্র।

তাশহুদ (আত্তাহিয়্যাতু)

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ـ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

উচ্চারণ ঃ আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াচ্ছালাওয়াতু ওয়াত্‌ত্বাইয়্যিবাতু, আচ্ছালামু আ'লাইকা আইয়্যুহান্ নাবিয়্যু ওয়া রহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্। আচ্ছালামু আ'লাইনা ওয়া আ'লা ই'বাদিল্লাহিছ্ ছলিহীন। আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'ব্দুহু ওয়া রাসূলুহু।

অর্থ ঃ "মৌখিক, শারীরিক, আর্থিক সমস্ত ইবাদত ও পবিত্রতা আল্লাহর জন্য। হে নবী ! আপনার প্রতি আল্লাহর রহমত, বরকত ও শান্তি বর্ষিত হউক। আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কেহ মা'বুদ নাই এবং ইহাও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সল্লি আ'লা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন্ কামা সল্লাইতা আ'লা ইব্রাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন্ কামা বারাক্তা আ'লা ইব্রাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! মুহাম্মাদ (সঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি সেইরূপ শান্তি বর্ষণ কর, যেইরূপ তুমি ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি বর্ষণ করিয়াছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও মহিমান্বিত। হে আল্লাহ ! মুহাম্মাদ (সঃ) ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ বর, যেইরূপ তুমি ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়াছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও মহিমান্বিত।

দোয়া মাসূরা

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি যালামতু নাফসী যুলমান কাছীরাওঁ ওয়ালা ইয়াগ ফিরুজ্জুনুবা ইল্লা আন্তা ফাগফিরলী মাগ ফিরাতাম মিন ইন্দিকা ওয়ার হামনী ইন্নাকা আন্তাল গাফুরুর রাহীম

অর্থ ঃ হে আমার আল্লাহ ! আমি আমার নফসের উপর অনেক জুলুম করিয়াছি। তুমি ছাড়া পাপ মার্জনাকারী কেহই নাই। অতএব হে আল্লাহ অনুগ্রহ পূর্বক তুমি আমার গুনাহ মাফ কর এবং আমার উপর দয়া কর। নিশ্চয়ই তুমি দয়াময় ও পাপ মার্জনাকারী।

সালাম ঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

উচ্চারণ ঃ আচ্ছালামু আ'লাইকুম ওয়া রহ্মাতুল্লাহি।

অর্থ ঃ তোমাদের প্রতি আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হউক।

দোয়া' কুনূত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ ـ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ ـ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্‌তাঈ'নুকা ওয়া নাস্‌তাগ্‌ফিরুকা ওয়া নু'মিনুবিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু আ'লাইকা ওয়া নুছনী আ'লাইকাল খাইরা ওয়া নাশ্‌কুরুকা ওয়ালা নাক্‌ফুরুকা ওয়া নাখ্‌লাউ' ওয়া নাত্‌রুকু মাইঁইয়াফ্‌জুরুকা। আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া লাকা নুছাল্লী ওয়া নাস্‌জুদু, ওয়া ইলাইকা নাসাআ' ওয়া নাহ্‌ফিদু ওয়া নারজূ রহ্‌তাকা ওয়া নাখশা-আজাবাকা, ইন্না আজাবাকা বিল্‌ কুফ্‌ফারি মুলহিক্ব।

মুনাজাত

উচ্চারণ ঃ রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুন্‌ইয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল্‌ আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা- আযাবান্নার। রব্বানা-তাক্বাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্তাস সামীউ'ল আ'লীম। ওয়াতুব্‌ আ'লাইনা ইন্নাকা আন্‌তাত্‌ তাওয়্যাবুর রহীম।

তওবায়ে ইস্তিগফার

উচ্চারণ ঃ আসতাগ্‌ফিরুল্লাহা রব্বী মিন্‌কুল্লি জাম্বিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।

অর্থ ঃ "আমি সমস্ত গুনাহ্‌ হইতে তওবা করিতেছি এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

নামাযের পরে তাসবীহ সমূহ

নিম্নের তাসবীহ সমূহ নির্দিষ্ট পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে ১০০ বার করিয়া পাঠ করিলে, আল্লাহর রহমতে দুনিয়া ও আখেরাতে মঙ্গল ও কল্যাণ সাধিত হইবে।

ফজর নামাযে هُوَالْحَيُّ الْقَيُّومُ (হুয়াল হাইয়্যাল কাইয়ূম)

অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ তা'আলা) জাবিত ও স্থায়ী

যোহর নামাযে هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ۔

উচ্চারণ ঃ হুয়াল আ'লিয়্যুল আ'যীম। অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ তা'আলা) বিরাট ও মহান।

আসর নামাযে هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

উচ্চারণ ঃ হুয়ার রহ্‌মানুর রহীম। অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ তা'আলা) কৃপাময় ও করুণাময়।

মাগরিব নামাযে هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۔

উচ্চারণ ঃ হুয়াল গফূরুর রহীম। অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ তা'আলা) ক্ষমাকারী ও দয়াশীল।

এশার নামাযে ঃ هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ۔

উচ্চারণ ঃ হুওয়াল্‌ লাত্বীফুল খাবীর। অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ তা'আলা) পবিত্র ও অতি সতর্ক।

ইহা ব্যতীত প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পরে سُبْحَانَ اللّٰهِ (সুবহানাল্লাহ) ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামুদ লিল্লাহ) ৩৩ বার এবং اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) ৩৪ বার মোট একশতবার পাঠ করিলে অশেষ নেকী লাভ হইবে এবং রিযিক বৃদ্ধি হইবে ও বরকত পাইবে।

নামাজের জন্য কয়েকটি সূরা (উচ্চারণ ও অর্থসহ)

সূরা ফাতিহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ـ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ـ اِهْدِ نَاالصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ـ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّالِّيْنَ ـ

اٰمِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন। আর-রহমানির রহীম। মালিকি ইয়াওমিদ্দীন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাছ্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাছ সিরাত্বল মুছতাক্বীম, সিরাত্বল্লাজীনা আন্‌ আ'মতা আলাইহিম। গা'ইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্‌ দ্বা-ল্লীন। আমীন।

সূরা নাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۔ مَلِكِ النَّاسِ ۔ إِلٰهِ النَّاسِ ۔ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۔ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۔ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۔

উচ্চারণ ঃ কুল্ আউ'যু বিরব্বিন্নাস। মালিকিন্নাস। ইলাহিন্নাস। মিন শাররিল্ ওয়াস্ ওয়াসিল্ খান্নাছ। আল্লাজী ইউওয়াস্ বিসু ফী ছুদূরিন্নাস্। মিনাল্ জিন্নাতি ওয়ান্নাস।

সূরা ফালাক্ব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۔ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۔ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۔ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۔ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۔

উচ্চারণ ঃ কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক্ব। মিন শাররিমা খালাক্ব। ওয়া মিন্ শাররি গাসিক্বীন ইযা ওয়াক্বাব্। ওয়া মিন শাররিন্নাফ্ ফাসাতি ফিল উ'ক্বাদ্। ওয়া মিন শাররি হাসিদিন্ ইযা হাসাদ্।

সূরা নসর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا ۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۔

উচ্চারণ ঃ ইজা-জা-আ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু, ওয়ারা আইতান্নাছা ইয়াদখুলূনা ফীদীনিল্লাহি আফওয়াজা। ফাসাব্বিহ্ বিহামদি রব্বিকা ওয়াছ তাগ্ফিরহু। ইন্নাহু কানা তাওয়্যাবা।

অর্থ ঃ যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসিবে, তখন আপনি দেখিবেন যে, মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। তখন আপনি নিজ প্রভুর প্রশংসাসহ তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিবেন। এবং তাহার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিবেন। নিশ্চয়ই তিনি অত্যাধিক ক্ষমাশীল।

সূরা কাফিরূন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۔ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۔ وَلَا أَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ ۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۔ وَلَا أَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ ۔ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۔

উচ্চারণ ঃ কুল্ ইয়া- আইয়্যুহাল্ কাফিরূন, লা- আ'বুদু মা তা'বুদূন। ওয়ালা আংতুম আ'বিদূনা মা-আ'বুদ। ওয়া লা-আনা আ'বিদুম্ মা-আ'বাত্তুম। ওয়া লা-আংতুম আ'বিদূনা মা-আ'বুদ। লাকুম্ দীনুকুম অলিয়া দ্বীন।

সূরা কাওসার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّا أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۔

উচ্চারণ ঃ ইন্না আ'ত্বাইনা কাল কাওছার। ফাছল্লি লি রব্বিকা ওয়ান- হার। ইন্না শানিয়াকা হুওয়াল আব্তার।

সূরা ইখলাছ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ۔ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۔ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۔

উচ্চারণ ঃ কুল হুআল্লাহু আহাদ। আল্লাহুছ্ ছামাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ, ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহূ কুফূওয়ান আহাদ্।

সূরা লাহাব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۔ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۔ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۔ وَّامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۔ فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۔

উচ্চারণ ঃ ত্বাব্বাত ইয়াদা- আবী-লাহাবিঁউ ওয়া তাব্বা। মা আগ্না- আ'নহু মালুহু-ওয়ামা কাসাব। ছাইয়াছ্‌লা-নারান্‌জাতা লাহাবিঁউ ওয়ামরাআতুহু, হাম্মা লাতাল হাত্বাব্‌। ফী-জী-দিহা- হাবলুম্‌ মিম্‌ মাসাদ্‌।

সূরা কুরাইশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۔ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۔ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۔ الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۔

উচ্চারণ ঃ লিঈলাফি কুরাইশিন, ঈলাফিহিম রিহ্‌লাতাশ্‌ শিতায়ি ওয়াছ্‌ ছইফ। ফাল ইয়া'বুদু রব্বা হাজাল বাইতিল্লাজী আত্বআ'মাহুম মিং যূ-য়ি'ওঁ ওয়া আমানামাহুম মিন্‌ খাউফ্‌।

সূরা ফীল,

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۔ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ ۔ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۔ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۔

উচ্চারণ ঃ আলাম তারা কাইফা ফাআ'লা রব্বুকা বিআছ্‌হাবিল ফীল। আলাম ইয়াজআ'ল কাইদাহুম ফী- তাদলীল। ওয়া আরসালা আলাইহিম ত্বাইরান্‌ আবাবীল। তারমীহিম বিহিজারাতিম্‌ মিন্‌ ছিজ্জীল। ফাজাআ'লাহুম কায়া'ছফিম্‌ মা'কূল।

কবর যিয়ারতের দোয়া

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ ۔

উচ্চারণ ঃ আচ্ছালামু আ'লাইকুম ইয়া আহ্‌লাল্‌ কুবূরি মিনাল্‌ মুস্‌লিমীনা ওয়াল মুসলিমাতি ওয়াল্‌ মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাতি, আন্‌তুম্‌ লানা সালাফুওঁ ওয়া নাহ্‌নু লাকুম তাবাউ'ন্‌ ওয়া ইন্না ইন্‌ শা-আল্লাহু বিকুম লাহিকুন।

এই দোয়া পাঠ করিবার পরে সূরা ফাতিহা, সূরা কাফিরূন, আয়াতুল কুরসী একবার করিয়া পাঠ করিবে। অতঃপর ১১ বার দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া ইহার সওয়াব কবরস্থানের মুর্দারগণের রূহের প্রতি সওয়াব রেছানী করিবে।

আর এইরূপে মুনাজাত করিবে। হে আল্লাহ ! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, মু'মিন মুসলমান নর-নারীদিগকে এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা জিবীত আছে এবং যাহারা মৃত্যুবরণ করিয়াছে, সকলকে ক্ষমা করিয়া দাও। নিশ্চয়ই তুমি দোয়া-প্রার্থনা কবুলকারী। হে দয়াময় প্রভু ! তুমি আমার পিতা-মাতাকে রহম কর, যেইরূপে তাহারা আমাকে শিশুকালে স্নেহের সহিত লালন-পালন করিয়াছেন। হে আল্লাহ ! সৃষ্টির সেরা সাইয়্যিদুল মুরসালীন খাতামুন্‌ নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) ও তাহার বংশধরগণ এবং সাহাবীগণের প্রতি রহম করুন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। সমস্ত জগতবাসীর প্রতিপালক, উহাদিগকে ও আমাদিগকে ক্ষমা করুন। আমীন।

তাকবীরে তাশরীক

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকাবার আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ্‌।

ঈদুল আজহা নামাজের নিয়্যত

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকয়া'তাই ছালাতি ঈদিল আদ্বহা মায়া' ছিত্তাতি তাকবীরাতি ওয়াজিবুল্লাহি তা'আলা, ইক্বতাদাইতু বিহাজাল ইমামি, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্‌ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

আক্বীক্বার দোয়া

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা হাযিহী আক্বীক্বাতুব্‌নী ফুলানিন্ দামুহা বিদামিহী ওয়া লাহ্‌মুহা বিলাহ্‌মিহী ওয়া আয্‌মুহা বিআয্‌মিহী ওয়া জিল্‌দুহা বিজিল্‌দিহী ওয়া শা'রুহা বিশা'রিহী। আল্লাহুম্মাজআ'লহা ফিদায়াল্ লিইব্‌নী মিনান্নারি। বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবার।

জানাযার নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُوَدِّى اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ فَرْضُ الْكِفَايَةِ اَلثَّنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِىِّ وَالدُّعَاءُ لِهٰذَ الْمَيِّتِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

বাংলা উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উয়াদ্দিয়া আরবাআ তাকবীরাতি সালাতিল জানাযাত ফারদিল কিফাইয়াতি আচ্ছানাউ লিল্লাহি তায়ালা ওয়াছ ছালাতু আলান্ নাবিইয়্যি ওয়াদ দুয়া'উ লিহাজাল মাইয়্যিতি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

বিঃদ্রঃ আর যদি মুর্দার মহিলা হয় তবে لِهٰذَ الْمَيِّتِ এর স্থলে بِهٰذِهِ الْمَيِّتِ পড়িতে হইবে।

বাংলা নিয়তঃ আমি ক্বেবলামুখী হইয়া এই ইমামের পিছনে ফরজে কেফায়া জানাযার নামায চার তাকবীরের সহিত আল্লাহর প্রশংসা, নবীর প্রতি দরূদ ও এই মুর্দারের জন্য দোয়া প্রার্থনা করিয়া আরম্ভ করিলাম, আল্লাহ আকবার।

জানাযার সানা

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَائُكَ وَلَااِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

বাংলা উচ্চারণ ঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা ওয়াতাবা-রাকাছমুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া জাল্লা ছানাউকা ওয়া লাইলাহা গাইরুক্।

জানাযা নামাযের দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَسَلَّمْتَ وَبَارَكْتَ وَرَحِمْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ

জানাযার দোয়া

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফিরলি হাইয়্যিনা ওয়ামাইয়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গাইবিনা ওয়া ছাগিরিনা ওয়া কাবিরিনা ওয়া জাকারিনা ওয়া উনছানা, আল্লাহুম্মা মান আহ্‌ইয়াইতাহু মিন্না ফাআহয়িহী আ'লাল ইসলামি ওয়ামান তাওয়াফ্‌ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্‌ফাহু আলাল ঈমানি, বিরহ্‌মাতিকা ইয়া আরহামার রহিমীন্।

দ্বীনের জন্য মহিলাদের উদ্দেশ্য মাওলানা সাইদ আহমদ খান সাহেবের মূল্যবান নসীহত

- সর্ব প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন খাদিজা (রাঃ)।
- সর্ব প্রথম শহীদ হলেন, হযরত সুমাইয়া (রাঃ)।
- দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্ব প্রথম বেশী ধন সম্পদ ব্যয় করেন হযরত খাদিজা (রাঃ)।
- সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)
- দ্বীনের জন্য সীমাহীন কষ্ট করেছেন হযরত আছিয়া (রাঃ) ফেরাউনের স্ত্রী।
- একজন নেককার নারী ৭০ জন অলীর চেয়ে উত্তম।
- একজন বদকার নারী এক হাজার বদকার পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট।
- একজন গর্ভবতী মহিলা দু'রাকাত নামাজ একজন গর্ভহীন মহিলার ৮০ রাকাত নামাজের চেয়েও উত্তম।
- যে মহিলা আল্লাহর ওয়াস্তে আপন সন্তানকে স্তনের দুধ পান করায় তার প্রত্যেক ফোটা দুধের বিনিময়ে এক একটি নেকী তার আমল নামায় লেখা হবে।

✪ যখন স্বামী বাইরে তেকে পেরেশান হয়ে বাড়ী ফেরে তখন যদি তার স্ত্রী স্বামীকে মারহাবা বলে সান্তনা দেয় ঐ স্ত্রীকে জিহাদের অর্ধেক নেকী দান করা হয়।

✪ যে মহিলা আপন সন্তানদের কারণে রাতে ঘুমাতে পারে না। তাকে ২০টি গোলাম আজাদ করার নেকী দান করা হয়।

✪ যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে রহমতের নজরে দেখে এবং স্ত্রীও স্বামীকে রহমতের নজরে দেখে। আল্লাহ গাফুরুর রাহীম ঐ দম্পতিকে রহমতের নজরে দেখেন।

✪ যে মহিলা স্বামীকে আল্লাহ রাস্তায় পাঠিয়ে দেন এবং নিজের স্বামীর অনুপস্থিতির কষ্ট খুশীর সাথে বরদাস্ত করে ঐ মহিলা পুরুষ অপেক্ষা ৫০০ বছর পূর্বে জান্নাতে যাবে। এবং ৭০ হাজার ফেরেশতা তাকে এস্তেকবাল করবেন। তিনি হুরদের সর্দারিনী হবেন। জাফরান দ্বারা তাকে গোসল করানো হবে এবং সেখানে সে স্বামীর অপেক্ষা করবে।

✪ যে মহিলা তার অসুখের কারণে কষ্ট ভোগ করে এবং তার পরেও সে সন্তানদের সেবা যত্ন করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঐ মহিলার পিছনের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন এবং ১২ বছরের নেকী দান করেন।

✪ যে মহিলা গরু, ছাগল, ভেড়া বা মহিষের দুধ দোহনের সময়ে বিস্‌মিল্লাহ বলে শুরু করে ঐ পশু তার জন্য দু'আ করে।

✪ যে মহিলা বিসমিল্লাহ্ বলে খাবার প্রস্তুত করে আল্লাহ তায়ালা ঐ খাবারে বরকত দান করেন।

✪ যে মহিলা বেগানা (পর) পুরুষকে উকি মেরে দেখে আল্লাহ জাল্লাজালালুহু ঐ মহিলাকে লানত (অভিসাপ্ত) করেন। ভিন্ন পুরুষের জন্য বেগানা মহিলাকে দেখা যেমন হারাম, তেমনি মহিলাদের জন্যও (বেগানা) পুরুষকে দেখা হারাম।

✪ যে মহিলা জিকিরের সাথে ঘর ঝাড়ু দেয়, আল্লাহ পাক তাকে খানায়ে কা'বা ঝাড়ু দেয়ার সওয়াব তার আমল নামায় লিপিবদ্ধ করেন।

✪ যে মহিলা নামাজ রোজার পাবন্দি করে, পবিত্রতা রক্ষা করে চলে এবং স্বামীর তাবেদারী করে চলে তাকে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে।

✪ দুই ব্যক্তির নামাজ মাথার উপর ওঠে না। (১) যে গোলাম তার মালিক থেকে পলায়ন করে। (২) ঐ নারী যে তার স্বামীর সাথে নাফরমানী করে।

✪ যে মহিলা গর্ভবতী অবস্থায় থাকেন তিনি বাচ্চা প্রসব না হওয়া পর্যন্ত দিনে রোজা ও রাত্রে নামাজরত থাকার নেকী পেতে থাকেন।

✪ সন্তান প্রসব কালীন সময়ে প্রসবের যে কষ্ট হয়, প্রতিবারের ব্যাথার কারণে হজ্জের নেকী দান করা হয়।

✪ সন্তান প্রসবের ৪০ দিনের মধ্যে মারা গেলে তাকে শাহাদতের সওয়াব ও মর্তবা দান করা হয়।

✪ সন্তান কান্নার কারনে যে মাতা সন্তানের জন্য বদ দু'আ দেয় না বরং সবর করে, সেই জন্য তাকে এক বছরের নফল নামাজের নেকী দান করা হয়।

✪ যখন বাচ্চাকে বুকের দুধ পান করানো হয় তখন আসমান থেকে একজন ফেরেশতা সুসংবাদ দেন যে, আপনার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দেয়া হয়েছে।

✪ যখন স্বামী বিদেশ থেকে আসে তখন যে স্ত্রী খুশী হয়ে তাকে খানা খাওয়ায় এবং সফর কালীন সময়ে স্ত্রী স্বামীর কোন হকের খিয়ানত না করে সে ১২ বছর নফল নামাজের সওয়াব পাবে।

✪ যে মহিলা তার স্বামীর খিদমত করে আল্লাহ তায়ালা তাকে ৭ তোলা স্বর্ণ সাদকাহ করার সওয়াব দান করেন।

✪ যে স্ত্রী স্বামীর সন্তুষ্টি নিয়ে ইন্তেকাল করেন তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব।

✪ যে স্বামী তার স্ত্রীকে একটি মাসয়ালা শিখাবে, সে স্বামীকে ৭০ বছর নফল ইবাদতের সওয়াব দান করা হবে।

✪ সকল জান্নাতীগণ আল্লাহ পাক এর সাক্ষাতে যাবে কিন্তু যে মহিলারা হায়া ও পর্দা রক্ষা করে চলেছে স্বয়ং আল্লাহ তাদের সাথে সাক্ষাতে আসবেন।

✪যে মহিলা পর্দা করে না, অন্য পুরুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে ঐ সমস্ত মহিলা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি জান্নাতের খুশবুও পাবে ।

✪ যে নারী স্বামীকে দ্বীনের উপর চলার জন্য তাকিদ করেন, তিনি মা আছিয়ার সাথে জান্নাতে যাবেন।

উম্মতওয়ালা ফিকির

(হযরত মাওলানা ইউসুফ (রঃ)-এর বয়ান)

হযরত মাওলানা ইউসুফ (রঃ) মৃত্যুর মাত্র তিন দিন পূর্বে ৩০শে মার্চ মঙ্গলবার ফজরের নামাজের পর লাহোরের রাইবেণ্ডে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। এটাই তার জীবনের শেষ গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ। তিনি বলেন, "দেখ আমার শারীরিক অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। সারা রাত্রি নিদ্রা হয় নাই। তবুও জরুরী মনে করে বলছি যে, বুঝে শুনে আমল করবে আল্লাহ্‌পাক তাকে সম্মানিত করবেন আর যে তা করবে না সে নিজের পায়ে নিজেই কুঠার মারবে।"

এ উম্মত বহু কষ্ট ও মোজাহাদায় তৈরী হয়েছে। এর জন্য নবী (সাঃ) এবং তাঁর ছাহাবীদের (রাঃ) বড় কষ্ট মোশাক্কত উঠাতে হয়েছে। মুসলমানদের চির শত্রু ইহুদী ও খৃষ্টানরা সর্বদাই এ ব্যাপারে সচেষ্ট ছিল যে, মুসলমান যেন এক উম্মত না থাকে। বরঞ্চ টুকরা টুকরা হয়ে যায়। বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে এক উম্মত হওয়ার গুন নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে এক হওয়ার চেষ্টা ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত মাত্র কয়েক লক্ষ সারা দুনিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। একটা পাকা ঘর পর্যন্ত ছিল না, এমনকি মসজিদ পর্যন্ত পাকা ছিল না। মসজিদে নববীতে বাতি পর্যন্ত ছিল না। সর্ব প্রথম বাতি জ্বালিয়েছিলেন তামিমদারী (রাঃ), যিনি নবম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবম হিজরী পর্যন্ত প্রায় সমস্ত আরব ইসলামে দাখিল হয়। বিভিন্ন কওম, ভাষা ও কবিলার লোক সকলেই এক উম্মতে পরিণত হয়েছিল। যখন সব কিছু হয়ে গিয়েছিল তখন মসজিদে নববীতে বাতি জ্বলেছিল। ততদিন পর্যন্ত নবী (সঃআঃ) যে হেদায়েতের নূর নিয়ে এসেছিলেন তা সমস্ত আরবে এমনকি তার বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে এক উম্মত তৈরী হয়ে গিয়েছিল। তারপর যখন এই উম্মত দুনিয়াতে উঠে দাঁড়াল হেদায়েত প্রচারের জন্য দেশের পর দেশ তাঁদের পদতলে লুটিয়ে পড়ল। এই উম্মত এমনিভাবে তৈরী হয়েছিল যে, তাঁরা কেউ নিজের বংশ,গোত্র, দল, আত্মীয়, দেশ বা ভাষার অধীন ছিলেন না। এমনকি নিজস্ব ধন-সম্পদ এবং বিবি বাচ্চাদের নিয়েও ব্যস্ত থাকতেন না। প্রত্যেক ওটাই খেয়াল করতেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ আঃ) কি বলেন। উম্মত তখনই বলবে যখন আল্লাহ ও রাসূল

(সাঃআঃ) এর হুকুমের সামনে সমস্ত আত্মীয়তারও অন্যান্য সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারা যাবে। যখন মুসলমান এক উম্মত হলে সারা জাতির মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে যেত। কিন্তু আজ হাজারো মুসলমানের গলা কাটা যাচ্ছে কিন্তু কারো এতটুকু পর্যন্ত কষ্টের অনুভুতি আসে না। উম্মত কোন কওম (গোত্র) বা এলাকার লোকের নাম নয় বরঞ্চ হাজারো কওম ও এলাকার লোক জুড়ে উম্মত বনে। যে লোক কোন এক কওম বা এলাকাকে নিজের মনে করে এবং অন্যান্যদেরকে পর মনে করে, সে উম্মতকে জবহ এবং টুকরা টুকরা করে। এবং সাথে সাথে নবী (সঃআঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের (রাঃ) মেহনতের উপর পানি ঢালে (বিদরুপ করে)। প্রথমে আমরাই উম্মতকে টুকরা টুকরা করার মাধ্যমে জবহ্ করেছি। ইহুদী খৃষ্টানেরা তো জবেহ্ করা উম্মতকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করেছে মাত্র।

যদি মুসলমান আবার এক উম্মত হয়ে যায় তবে দুনিয়ার সমস্ত শক্তি একত্রিত হয়েও তাদের একটা চুল পর্যন্ত ছিড়তে পারবে না। এমনকি এটম বোমা ও রকেট পর্যন্ত তাদের বিন্দু মাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু যদি তারা কওমগত ও এলাকাগতভাবে নিজেদেরকে টুকরা টুকরা করতে থাকে তবে খোদার কসম তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য সামন্ত তোমাদের বাঁচাতে পারবে না।

মুসলমান আজ সমস্ত দুনিয়াতে মার খাচ্ছে এবং অপমানিত হচ্ছে এ কারণে যে, তারা উম্মতপানাকে বিচ্ছিন্ন করে নবী (সঃ)-এর মেহনতের ও কোরবানীর ক্ষতি করেছে।

আমি অন্তরের দুঃখের সাথে বলছি যে সমস্ত ধ্বংস বা সর্বনাশ এজন্য যে উম্মত এক উম্মত থাকে নাই। বরঞ্চ এটাও ভুলে গিয়েছে যে, উম্মত কি জিনিস এবং নবী (সঃ) কিভাবে উম্মতকে বানিয়ে ছিলেন। উম্মত হওয়ার জন্য এবং মুসলমানদের সাথে আল্লাহ পাকের সাহায্য আসার জন্য শুধু এটাই যথেষ্ট নয় যে, তাদের মধ্যে নামাজ কায়েম হয় বা জিকির চালু হয় বা মাদ্‌রাসা ও তার তালিম হয়। হযরত আলী (রাঃ)-এর হত্যাকারী ইবনে মুলজেম এমন নামাজী ও জাকের ছিল যে, যখন তাকে হত্যা করার সময় ক্রুদ্ধ লোকেরা তার জিহবাকে কাটতে চেয়েছিল তখন সে বলে যে, সব কিছু কর কিন্তু আমার জিহবাকে কেটনা যাতে আমি আমার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আল্লাহ পাকের জিকির করতে পারি।" এতদসত্বে নবী (সাঃ) বলেছিলেন "আমার উম্মতের সবচেয়ে খারাপ লোক হবে আলী (রাঃ)-এর হত্যাকারী।

অপর দিকে মাদ্রাসার তালিম তো আবুল ফজল ফেজীও নিয়েছিল। এমনকি এত অধিক জ্ঞান হাছেল করেছিল যে, পবিত্র কোরআন শরীফের তফসীর নোকতা বিহীন অক্ষর দ্বারা করেছিল। অথচ সেই তো আকবরকে গোমরাহ করেছিল এবং ইসলামকে ধ্বংস করেছিল।

তাহলে যে জিনিস ইবনে মুলজেম ও আবুল ফজল ফৈজীর মধ্যে ছিল তা কেমন করে উম্মত বনার জন্য ও আল্লাহপাকের গায়েবী সাহায্য পাওয়ার জন্য যথেষ্ট হতে পারে?

হযরত শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এবং সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহ) এবং তাদের সাথীরা দ্বীনদারীর দিক দিয়ে অতীব মর্যাদাশীল ছিলেন। তারা সীমান্ত এলাকায় উপস্থিত হলে সেখানকার লোকেরা তাদেরকে নেতা বানিয়ে নিলেন। কিন্তু শয়তান ওখানকার কিছু বদ মুসলমানের দীলে একথার ধোঁকা দিলে যে, তাঁরা বাহিরের অন্য এলাকার লোক, এখানে কেন তাদের নেতৃত্ব চলবে।

ফলে কিছু লোক বিদ্রোহ করল এবং তাদের কিছু সাথীকে শহীদ করে ফেলল। এই রকম ভাবে মুসলমানেরা আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে উম্মতকে টুকরা টুকরা করল। ফলে আল্লাহ্পাক শাস্তি স্বরূপ তাদের উপর ইংরেজদের চড়াও করে দিলেন।

মনে রেখ "আমার কওম" আমার এলাকা "আমার আত্মীয়" এই জাতীয় কথাগুলো উম্মতকে টুকরা টুকরা করে। আর এই সমস্ত কথা আল্লাহপাকের কাছে এত অপছন্দীয় যে, হযরত সাদ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) যিনি এত উঁচু স্তরের আনসারী ছাহাবী ছিলেন যে, তাঁর দ্বারা যে ভুল হতে যাচ্ছিল তা যদি চাপা পড়ে না যেত তবে আনসার ও মোহাজেরদের মধ্যে একটা যুদ্ধ হয়ে যেত। তার ফল তাকে দুনিয়াতেই ভোগ করতে হয়েছিল। রেওয়ায়েত আছে যে, তাকে জ্বীনেরা কতল করেছিল এবং মদীনাতে এই আওয়াজ শুনা যেত আমরা সাদ বিন ওবাদাকে কতল করেছি, তীর দ্বারা তার দীলকে বিদ্ধ করেছি কিন্তু বক্তাকে দেখা যেত না।

উপরোক্ত ঘটনাবলী আমাদের ঐ শিক্ষা দেয় যে, যদি ভাল থেকে ভাল লোক, বংশীয় ও আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে উম্মতকে বিভক্ত করে তবে আল্লাহ্পাক তাকেও টুকরা করবেন।

উম্মত তখনই গঠিত হবে যখন উম্মতের সর্বস্তরের লোকেরা দলাদলি রেষারেষি ভুলে ঐ কাজে লেগে যাবে যা নবী (সঃ) আমাদের উপর অর্পন করে গেছেন। আর জেনে রেখ উম্মতকে ধ্বংস করে মোয়ামালাত (ব্যবসা বাণিজ্য, ব্যবহার) এবং মোয়াশারাত (সামাজিক সম্পর্কসমূহ)-এর খারাবী সমূহ।

(১) ব্যক্তিগত বা দলবদ্ধভাবে যখন একে অন্যের উপর অবিচার ও জুলুম করে, আর তার হককে নষ্ট করে, তাকে কষ্ট দেয় অথবা ছোট মনে করে, বা ঘৃণা ও অপমান করে তখনই বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং উম্মতপনা নষ্ট হয়।

তার জন্য আমি বলি যে, শুধু কালেমা, নামাজ ও তছবিহ দ্বারা উম্মত বনে না। উম্মত তৈরী হবে লেনদেন ও সামাজিক রীতি নীতির পরিবর্তনের দ্বারা এবং সকলের হক আদায় করাও তাদের একরাম করার দ্বারা। বরঞ্চ তখনই উম্মত বনে যখন অন্যের জন্য নিজের হককে ও দাবীকে কোরবানী করা হবে।

হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ) প্রমুখগণ নিজেদের সমস্ত কিছু কোরবানী করেও নিজেরা কষ্ট স্বীকার করে এই উম্মতকে তৈরী করেছিলেন।

একদা হযরত ওমর (রাঃ) এর যামানায় লাখো কোটি টাকা আসে (গনিমতের মাল) তখন পরামর্শ হল কিভাবে এই মালসমূহ ভাগ বন্টন করা হবে উম্মতের মধ্যে। তখন উম্মত তৈরী হয়ে গিয়েছিল। ঐ মাশোয়ারাতে (পরামর্শ সভা) এক বংশ বা গোত্রের লোক ছিল না। বরঞ্চ বিভিন্ন স্তরের লোক ছিলেন। নবী (সঃ)-এর বংশের লোকরা, তারপর হযরত আবু বকরের (রাঃ) বংশের লোকেরা, তারপর হযরত ওমর (রাঃ)-এর বংশের লোকেরা।

এই নিয়মে হযরত ওমর (রাঃ) এর কবিলা তিন নম্বরে ছিল। যখন এই পরামর্শ হযরত ওমর (রাঃ) এর সামনে পেশ করা হল, তিনি তা কবুল করলেন না। বরঞ্চ বললেন, এই উম্মত যা পেয়েছে এবং পাচ্ছে তা একমাত্র নবী (সঃ) এর সব চেয়ে নিকটবর্তী হবেন তাকে তত বেশী মাল দেয়া হবে। তারপর যারা সম্পর্কের দিকে যত দুরের হবেন তাদের ভাতা সেই অনুযায়ী কমতে থাকবে। এভাবে সবচেয়ে বেশী বনি হাসেম, তারপর বনি আবদে মন্নাফ, তারপর কুরাইশের সন্তানরা, তারপর কেলাব, তাপর কা'ব। এভাবে ওমর (রাঃ) এর

কবিলা অনেক পিছে পড়ে যায়। ফলে ভাগেও তারা কম পেল। কিন্তু ওমর (রাঃ) এর রায়কেই মেনে নিলেন, যদিও মালের বন্টনে নিজের কবিলা বহু পিছনে চলে গেল। এভাবেই এ উম্মত তৈরী হয়েছিল।

উম্মত তৈরী হওয়ার ব্যাপারে এটা খুবই জরুরী যে, সকলেই যেন এ চেষ্টা করে যাতে তাদের সকলের মধ্যে আপোষ মিল সৃষ্টি হয়। তাদের মধ্যে যেন কোন বিভেদ সৃষ্টি না হয়। নবী (সাঃ)-এর এক হাদীসের সারাংশ এই যে, "কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে ডাকা হবে যে দুনিয়াতে নামায, রোজা, হজ্ব, তাবলীগ সব কিছুই করেছিল কিন্তু তথাপিও তাকে আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। কারণ তার কোন এক কথায় উম্মতের মধ্যে দলাদলি ও বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। তাকে বলা হবে, তোমার ঐ কথার শাস্তি ভোগ করে নাও যার কারণে উম্মতের ক্ষতি হয়েছিল।

তারপর অন্য এমন এক ব্যক্তিকে ডাকা হবে যার নিকট নামাজ, রোজা, হজ্ব ইত্যাদি ভাল আমল খুবই কম হবে। ফলে সে আল্লাহ্র আযাবের ভয় করতে থাকবে। কিন্তু তাকে বহু পুরষ্কারে সম্মানিত করা হবে। তখন সে অবাক হয়ে প্রশ্ন করবে, আমার এ সম্মান কিসের? তাকে বলা হবে অমুক দিন তোমার একটা কথায় এ ঝগড়া থেমে গিয়েছিল, বরঞ্চ তাদের মধ্যে আপোষ মিল পয়দা হয়েছিল। আজকের এই সমস্ত নেয়ামত তারই বদলায়।

উম্মতের মধ্যে মিল সৃষ্টি করাও তাদের মধ্যে ভাঙ্গন পয়দা করার বিষয়ে সবচেয়ে বেশী ভূমিকা হল মুখের কথার। মুখের কথা দ্বারা মানুষে মানুষে মিল হয় বা ভাঙ্গন হয়। মুখের একটা ভুল বেফাস কথার জন্য ঝগড়া সৃষ্টি হয়, এমনকি লাঠালাঠি এবং দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয়ে যায়। আবার অন্য দিকে মুখের এই কথাই তাদের মধ্যে মিল ও মহববত সৃষ্টি করে এবং ভাঙ্গা দিলকে জোড়া লাগায়।

তাই আমাদের জন্য এটা খুবই জরুরী যে, আমরা আমাদের জবানকে সংযত করব। এটা তখনই সম্ভব হবে যখন বান্দা সর্বদা এই খেয়াল রাখবে যে, আল্লাহ্ সর্বদা তার সাথে আছেন (তাঁর এলেমের কুদরতের দ্বারা) এবং তার সমস্ত কথাই শ্রবণ করেন।

মদীনার আনসারদের দু'টি বিশিষ্ট কবিলা ছিল আউস এবং খাজরাজ ইসলামের পূর্বে তাদের মধ্যে বংশ পরম্পরায় যুদ্ধ চলত। নবী (সঃ) যখন হিজরত করে মদীনা শরীফে তশরীফ নেন এবং আনসারদের ইসলামে প্রবেশ করার তৌফিক হয়, তখনই তাঁদের শত শত বৎসরের এ লড়াই বন্ধ হয়ে যায়। তারপর তারা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেলেন। ফলে ইহুদীরা চক্রান্ত করতে শুরু করল কিভাবে আবার তাদের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করা যায়।

একদা এক মজলিসে যেখানে উভয় কবিলার আনসারই উপস্থিত ছিলেন, তখন এমন একটা কবিতা পড়া হয় যাতে পুরাতন যুদ্ধের উস্কানী ছিল। ফলে আগুন জ্বলে উঠল এবং একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে খাড়া হয়ে গেল। সাথে সাথে কেউ নবী (সঃ) কে এই বিষয়ে সংবাদ দিলেন। সংগে সংগে তিনি তাশরীফ নিলেন এবং তাদের লক্ষ্য করে বললেনঃ "আমি উপস্থিত থাকতেই তোমরা নিজেদের মধ্যে খুন খারাবী করবে"? তারপর খুবই ছোট কিন্তু দরদ ভরা এক খোতবা (ভাষণ) দিলেন ফলে উভয় দলই বুঝতে পারল যে, শয়তান তাদের উস্কিয়েছে। ফলে উভয় দলই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো এবং গলায় গলায় মিলে গেলে তখন এই আয়াত নাজেল হলঃ

"(হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করার মত ভয় এবং মুসলমান না হয়ে মরোনা)।

ব্যাখ্যাঃ মানুষ যখন সর্বদা আল্লাহ্পাকের ধ্যান করবে এবং তাঁর ভয়ানক আযাবকে ভয় করবে এবং তাঁরই আনুগত্য করবে তখন শয়তান তাকে ভুলাতে পারবেনা। একমাত্র তখনই উম্মত বিচ্ছিন্নতা ও সমস্ত খারাবী থেকে রক্ষা পাবে।

আল্লাহপাক অন্যত্র এরশাদ করেন, (তোমরা সকলে মিলে আল্লাহ্পাকের রশিকে অর্থাৎ কোরআন পাক ও তাঁর দ্বীনকে শক্ত করে পাকড়িয়ে ধর। আল এমরান-১০২)

অর্থাৎ সমষ্টিগতভাবে উম্মতপনা গুণের সাথে মিলে মিশে দ্বীনের রজ্জুকে আঁকড়ে ধর এবং তাতে জমে থাক অর্থাৎ গোত্রগত, বা দেশগত, ভাষাগত বা অঞ্চলগতভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেওনা)।

ঐ আল্লাহ্পাকের নেয়ামতকে ভুলোনা, যিনি তোমাদের ভিতরের শত্রুতা, মারামারি, কাটাকাটি যা বংশ পরম্পরায় চলে আসছিল তা বন্ধ করে দিয়ে

তোমাদের মধ্যে ভালবাসা পয়দা করে দিয়েছিলেন। ফলে তোমরা তার দয়াতে ভাই ভাইয়ে পরিণত হয়েছিল। পারস্পরিক লড়াই ঝগড়ার কারণে তোমরা যখন দোজখের কিনারায় এসে দাঁড়িয়ে ছিলে এবং তাতে পতিত হচ্ছিলে আল্লাহ্‌পাক তাথেকে তোমাদের উদ্ধার করেছিলেন। (আল এমরান-১০৩)

ব্যাখ্যাঃ শয়তান সর্বদা তোমাদের সাথে আছে। তার হাত হতে বাঁচার একমাত্র উপায় হল তোমাদের মধ্যে একটা দল এমন হবে যে, তাদের কাজই হবে ভাল এবং নেকের দিকে ডাকা এবং সমস্ত খারাবী ও ফাসাদ হতে মানুষকে ফিরানো।

এই সম্বন্ধে আল্লাহ্‌পাক বলেনঃ "(তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা দরকার যারা মানুষকে ভালর দিকে ডাকবে। (অর্থাৎ দ্বীন এবং সব রকম ভালর দিকেই মানুষকে ডাকবে। যেমন ঈমান, নামাজ, জিকির এবং সাথে সাথে এগুলোর উপর মেহ্‌নত করবে) এবং খারাবী ও পাপ হতে মানুষদের বাঁচানোর চেষ্টা করবে) (ফলে এই মেহ্‌নতেই উম্মত ব'নবে) আর তারাই হচ্ছেন সফলকাম।

তাদের মত হয়োনা যারা হেদায়েত পাওয়ার পরও শয়তানের অনুসরণ করে পৃথক পৃথকভাবে চ'লে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং উম্মতপনাকে ধ্বংস করে। ফলে তাদের উপর আল্লাহপাকের শক্ত আযাব আসবে। (আল এমরান-১০৪-১০৬)

ব্যাখ্যাঃ দ্বীনের প্রতিটি শিক্ষা জোড় বা মিল সৃষ্টি করার জন্য। নামাজ রোজাতে জোড়, হজ্জে জোড়, বিভিন্ন দেশ, গোত্রে এবং ভাষাভাষীর লোকের। তা'লিমের হাল্কা জোড় পয়দা করার জন্য, মুসলমানদের একরাম এবং পরস্পরিক মহব্বত, হাদিয়া দেয়া নেয়া করা ইত্যাদি, সমস্ত উঁচু আমলই মিল মহব্বত পয়দা করা এবং জান্নাতে যাওয়ার আমল। কেয়ামতের দিন এই কাজের জন্য মেহ্‌নতকারীদের চেহারা নূরে (আলো) উদ্ভাসিত হবে।

অন্য দিকে যারা পরস্পরের মধ্যে হিংসা দ্বেষ, গিবত, চুগলখুরী, বদনাম ছড়াবে যা দ্বারা উম্মতের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে এবং জাহান্নামের দিকে লোকদের ধাবিত করে। আখেরাতে এই সমস্ত বদ আমলকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত ও অপমানিত হবে।

উপরের আয়াতে তাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যারা উম্মতের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে বা তার জন্য চেষ্টা করে কেয়ামতের দিন তারা কাল চেহারা নিয়ে উঠবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা তো ঈমান এবং ইসলাম পাওয়ার পর আবার কুফরি করেছো। তাই ঐ কুফরির শাস্তি স্বরূপ আযাব ভোগ কর। আর যারা সঠিক রাস্তায় চলেছিল তাদের চেহারা নূরে চমকিত হতে থাকবে, তারা সর্বদা আল্লাহ্‌পাকের রহমত (দয়া) এর মধ্যে চিরস্থায়ী জান্নাতে থাকবে। (আল এমরান ১০৬-১০৭)

আমার ভাই ও দোস্তরা! এ সমস্ত আয়াত তখনই অবতীর্ণ হয়েছিল যখন ইহুদীরা মদীনার আনসারদের দুই গোত্রের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাতে চেষ্টা করেছিল এবং একের বিরুদ্ধে অন্যকে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই আয়াতে মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ ও লড়াইকে কুফরী কাজ বলা হয়েছে এবং সাথে সাথে আখেরাতের কঠোর আযাবের হুমকি দেয়া হয়েছে।

আজ সমস্ত দুনিয়াতে উম্মতকে বিচ্ছিন্ন করার মেহ্‌নত চলছে। তা হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার একমাত্র রাস্তা হল তোমরা নবীওয়ালা মেহনতে লেগে যাও। মুসলমানদের ডেকে ডেকে মসজিদে আনতে থাক, যেখানে ঈমানের কথাবার্তা হবে, তা'লিম ও জিকিরের হাল্কা হবে, দ্বীনের মেহনতের পরামর্শ হবে। বিভিন্ন শ্রেণীর, আত্মীয়তার এবং ভাষা-ভাষীদের মসজিদে এনে নব্বীর (সঃ) তরীকায় একত্রিত কর এবং এই কাজে মিলাও। তবেই উম্মত তৈরী হবে।

সাথে সাথে ঐ সমস্ত কথাবার্তা হতে নিজেদের বিরত রাখ যাদ্বারা শয়তান বিভেদ সৃষ্টি করার সুযোগ পায়। যখন তিন ব্যক্তি একত্রিত হও মনে রেখ চতুর্থ জন আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। এবং পাঁচ ছয় জন একত্রিত হলে মনে রেখ আল্লাহ আমাদের মধ্যে ষষ্ঠ বা সপ্তম। তিনি আমাদের দেখছেন এবং আমাদের সমস্ত কথা শ্রবণ করছেন। আমরা কি উম্মত বানানোর কথা বলছি, না আমরা উম্মতকে বিভক্ত করার কথা বলছি? আমরা কারো গিবত, চুগলখুরী করছি, নাকি কারো বিরুদ্ধে অন্যকে উস্কানী দিচ্ছি?

উম্মত তৈরী হয়েছিল নবী (সাঃ)-এর রক্ত প্রবাহ ও অনাহারের কষ্টের মাধ্যমে। আর আজ আমরা সামান্য কারণে উম্মতকে বিভক্ত করছি। মনে রেখ,

জুম্মা ও নামায ত্যাগের জন্য এত পাকড়াও হবে না যতটা হবে উম্মতকে বিভক্ত করার জন্য। মুসলমানদের মধ্যে যদি উম্মতপনা এসে যায় তবে কক্ষণও তারা দুনিয়াতে অপমানিত হবে না। এমনকি রাশিয়া ও আমেরিকার শক্তিও তাদের সামনে নতি স্বীকার করবে। উম্মতপনা তখনই আসবে যখন এক মুসলমান অন্য মুসলমানের কাছে নিজকে ছোট বা নম্র করবে।

আর সাথে সাথে ভদ্র ভাবে ব্যবহার করবে। আর এরই চর্চা জামাতে গিয়ে করতে হবে। যখন আমাদের মধ্যে মুসলমানদের সামনে নত হওয়ার গুণ আসবে তখনই আমরা কাফেরদের মুকাবেলায় যবরদস্ত ইজ্জত ওয়ালা এবং বিজয়ী হব, আর সে কাফের ইউরোপ, আমেরিকা বা এশিয়া যেখানকারই হোক না কেন।

মুসলমানদের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেনঃ "(মোমেনদের সাথে কোমল হবে আর কাফেরদের সাথে কঠোরতা করবে)। (মায়েদা-৫৪)

হে আমার ভায়েরা ও দোস্তরা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) সমস্ত নিন্দনিয় কথা বলাকে কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেণ। যদ্বারা দিলের মধ্যে ফাটল ধরে এবং বিভেদ সৃষ্টি হয়। দুয়ে দুয়ে, চারে চারে মিলে কানা ঘুষা করার দ্বারা শয়তান দিলের মধ্যে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করে। তাই ঐ সমস্ত আমল করা হতে বিরত থাকার জন্য কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এবং এগুলোকে শয়তানের কাজ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আল্লাহপাক বলেনঃ "(নিশ্চয়ই গোপন শলাপরামর্শ শয়তানের কাজ যাতে করে ঈমানদারদের পেরেশাণ করতে পারে। কিন্তু আল্লাহপাকের ইচ্ছা ব্যতীত সে কারও কোন ক্ষতি করতে পারবে না)। (মুজাদালাহ-১০)

একইভাবে কাকেও ছোট মনে করা, ঘৃণা, উপহাস করা এবং ঠাট্টা বিদ্রুপ করা হতে নিষেধ করা হয়েছে।

এ সম্বন্ধে আল্লাহপাক বলেনঃ "(সাবধান, একদল যেন অন্য দলের সাথে বিদ্রুপ না করে। হতে পারে যাদের বিদ্রূপ করা হচ্ছে তারা তাদের থেকে উত্তম।-(হুজুরাত-১১)

সাথে সাথে ঐ কাজকেও নিষেধ করা হয়েছে যে, যার যে দোষের কথা আমার জানা নেই তা কৌশলে জেনে নেয়া, যে দোষের কথা জানা আছে তা

অন্যের সামনে আলোচনা করা। এজন্য গীবতকে হারাম করা হয়েছে। গীবত হচ্ছে কারও কোন দোষ যা জানা আছে তা অন্যের সামনে প্রকাশ করা।

আল্লাহপাক আরো বলেনঃ "(তোমরা পরস্পরের দোষ অন্বেষণ করনা এবং একে অন্যের গীবতও করনা। (হুজুরাত-১২)

ছোট মনে করা, তামাশা, ঠাট্টা, বিদ্রুপ করা, গীবত করা এবং দোষ খোঁজাখুঁজি করা এ সমস্ত কাজই মানুষের ভিতর বিভেদ সৃষ্টি করে উম্মতপনাকে ভেঙ্গে দেয়। তাই এ সমস্ত কাজগুলোকে হারাম করা হয়েছে এবং যে সমস্ত আমল উম্মতকে সংযুক্ত রাখে যেমন একরাম করা, এহতেরাম বা সম্মান করা ইত্যাদির প্রতি তাকিদ দেয়া হয়েছে। কারণ, এর দ্বারা উম্মত বনেনা, বরঞ্চ বিগড়ায়। উম্মত তখনই তৈরী হবে যখন প্রত্যেকে এটা দৃঢ় ভাবে ধারণা করবে যে, আমি সম্মান প্রাপ্তির উপযুক্ত নই। এজন্য কারো নিকটে সম্মান পাওয়ার আশা ও চেষ্টা না করা। বরঞ্চ অন্যের সম্মান করা। এই ধারণা করা যে, অন্যরাই এর উপযুক্ত এবং আমিই তাদের সম্মান ও একরাম করব।

নিজের নফসের ও ব্যক্তিত্বের কোরবানী করতে হবে। তাদের বুঝাতে হবে যদি উম্মত বনতে পার তবেই ইজ্জত পাবে।

ইজ্জত আমেরিকা বা রাশিয়ার নকসা বা পদ্ধতির মধ্যে নাই। বরঞ্চ তা আল্লাহ পাকের হাতে এবং তাকে একটা বিশেষ নিয়মের মধ্যে পেতে হবে। যে কওম বা দল দুনিয়াতে সম্মান পাওয়ার কাজ করবে আল্লাহপাক তাদের সম্মানিত করবেন। আর যারা ধ্বংসের কাজ করবে তাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন। ইহুদীরা নবীর বংশধর ছিলো। কিন্তু তারা নিয়মের উল্টা চলেছিল ফলে আল্লাহপাক তাদেরকে অপদস্থ করেছেন।

অন্য দিকে সাহাবারা মূর্তি পুজকদের সন্তান ছিলেন। কিন্তু তারা উত্তম আমল করেছিলেন ফলে আল্লাহপাক তাদেরকে দুনিয়াতে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহপাকের কাজে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নাই। আছে শুধু তাঁর নিয়ম ও হুকুমাবলীর অনুসরণ।

দোস্তরা আমার! নিজেদেরকে এই মেহনতের মধ্যে লিপ্ত করে দাও যাতে নবী (সঃ)-এর উম্মতের মধ্যে উম্মত বোধ জাগ্রত হয়। তাদের মধ্যে ঈমান ও

একীন এসে যায়, জিকির তসবীহ এসে যায়। আর সাথে সাথে তালিম প্রদানকারী আল্লাহপাকের সামনে সমর্পিত, খেদমতকারী, কষ্ট সহিষ্ণু অন্যকে ইজ্জত ও একরামকারী উম্মত ব'নে যায়।

অন্য দিকে যেন গোপন পরামর্শকারী, আল্লাহপাকের না-ফরমান নিজের ভাইয়ের ও সাথীদের বিদ্রুপকারী ও গীবতকারী উম্মত ব'নে না যায়।

যদি কোন একটা এলাকাতেও ঐ ধরনের মেহনত চালু হয়ে যায় যে ধরনের হওয়া উচিত তবেই সারা দুনিয়াতে সত্যিকারের মেহনত চালু হয়ে যাবে।

তাই এর এহতেমাম (কদর) করার জন্য বিভিন্ন গোত্রের, এলাকার স্তরের, ভাষার লোকদের একত্রিত করে জামাতে পাঠাতে শুরু কর এবং উছুল বা নিয়মের পাবন্দির সাথে মেহনত করতে থাক। তবেই ইন্‌শাআল্লাহ উম্মত বনার কাজ চালু হবে এবং তখন নফস ও শয়তানও আর কিছুই করতে পারবে না ইন্‌শাআল্লাহ।

ছয় নম্বর

নাহমাদুহু ওয়ানু সাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম।

কয়েকটি গুণের উপর মেহনত করে আমল করতে পারলে দ্বীনের উপর চলা সহজ।

গুণ কয়টি হল ঃ (১) কালেমা, (২) নামাজ, (৩) ইলম ও যিকির, (৪) ইকরামুল মুসলিমিন, (৫) তাসহিহে নিয়্যত, (৬) তা'বলীগ।

(এক) কালেমা

لَآاِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

(লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।)

অর্থঃ আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, আর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার রাসূল।

কালেমার উদ্দেশ্য ঃ আমাদের দুই চোখে যা কিছু দেখি আর না দেখি আল্লাহ ছাড়া সবই মাখলুক। আর মাখলুক কিছুই করতে পারেনা আল্লাহর হুকুম ছাড়া। আল্লাহ সব কিছু করতে পারেন মাখলুক ছাড়া।

এক মাত্র হুজুর (সঃ)এর নূরানী তরীকায় দুনিয়া এবং আখেরাতের শান্তি ও কামিয়াবী।

কালেমার লাভ ঃ যে ব্যক্তি একীন ও এখলাসের সাথে এ কালেমা একবার পাঠ করবে আল্লাহপাক তার পিছনের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিবেন।

হাদীসে আছে, যেই ব্যক্তি প্রতিদিন এ কালেমা ১০০ বার পাঠ করবে কিয়ামতের দিন তার চেহারা পূর্ণির চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল করে উঠাবেন।

কালেমার লাভ ঃ ১। হুজুরে পাক (সঃ) এরশাদ করেন- যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ ভাবে অজু করে। অতঃপর কালেমায়ে শাহাদাৎ পাঠ করে আল্লাহপাক তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেন সে ব্যক্তি যেই দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। ২। হুজুর (সঃ)এরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি কালেমায়ে তাইয়েব একশতবার পাঠ করবে কিয়ামতের দিন তার চেহারা পূর্ণির চাঁদের মত উজ্জল করে উঠানো হবে। ৩। হুজুর (সঃ) এরশাদ করেন, শিশুরা যখন কথা বলতে আরম্ভ করে তখন তাকে কালেমা শিক্ষা দাও। ৪। হুজুর (সঃ) এরশাদ করেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর চেয়ে বড় কোন আমল নাই এবং উহা গোনাহকে মাফ না করাইয়া ছাড়ে না। ৫। হুজুর (সঃ) এরশাদ করেন, ঈমানের ৭০টি শাখা রয়েছে, আরেক বর্ণনায় রয়েছে ৭৭টি শাখা আছে তম্মধ্যে সর্বোত্তম হইল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করা।

কালেমা হাসিল করার তরীকা ঃ এই কালেমা আমি বেশী বেশী পাঠ করি আর লাভ জানিয়ে অপর ভাইকে দাওয়াত দেই ও দোয়া করি।

(দুই) নামাজ

নমাজের উদ্দেশ্য ঃ হুজুর পাক (সঃ) যেভাবে নামাজ পড়তে বলেছেন এবং সাহাবাদেরকে যেই ভাবে নামাজ শিক্ষা দিয়েছেন সেই ভাবে নামাজ পড়ার যোগ্যতা অর্জন করা।

নামাজের ফযীলত ঃ যেই ব্যক্তি পাচঁ ওয়াক্ত নামাজ সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে গুরুত্ব সহকারে আদায় করবে আল্লাহপাক তাকে নিজ দায়িত্বে জান্নাতে প্রবশ করাবেন। যেই ব্যক্তি নামাজের ব্যাপারে যত্নবান হবেন আল্লাহপাক তার যিম্মাদারী নিবেন। আর যেই ব্যক্তি নামাজের ব্যাপারে যত্নবান হবে না আল্লাহ তার কোন দাযিত্ব নিবেন না।

নামাজের লাভ ঃ ১। আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী (সঃ)এরশাদ করেন, কোন ব্যক্তির নামাজ যা জামাতে পড়া হয়েছে উহা ঘরে কিংবা বাজারে একাকী পড়ার চাইতে পচিঁশ গুণ বেশী ছওয়াব। (রাখারী)

২। প্রিয় নবী (সঃ)এরশাদ করেন, জামাতের নামাজ একা নামাজ হইতে ২৭ গুণ বেশী ছওয়াব। (বোখারী) ৩। প্রিয় নবী (সঃ)এরশাদ করেন, যদি কোন ব্যক্তি উত্তম রূপে অজু করে নামাজ আদায়ের নিয়তে মসজিদে গিয়ে দেখে

নামাজ শেষ হয়ে গেছে তবে সে জামাতে নামাজ আদায়ের ছওয়াব পাইবে এবং জামাত প্রাপ্তদের ছওয়াব বিন্দু মাত্রও কম করা হবে না। (আবু দাউদ) ৪। হে নবী আপনার পরিজনদেরকে নামাজের হুকুম করুন ও আপনি নামাজের ব্যাপারে যত্নবান হউন। আপনার নিকট আমি কোন রিজিক চাইনা কেননা রিজিক ত আমিই আপনাকে দান করব। ৫। প্রিয় নবী (সঃ)এরশাদ করেন, যারা রাতের অন্ধকারে বেশী বেশী করে মসজিদে গমন করে তাদেরকে কিয়ামতের দিবসের পূর্ণ নূরের সুসংবাদ দান কর। (ইবনে মাজা)

নামাজ হাসিল করার তরীকা ঃ পাচঁ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে আদায় করি, ওয়াজিব ও সুন্নত নামজের প্রতি যত্নবান হই ও কাযা নামাজগুলি খুঁজে খুজে আদায় করি। নামাজের লাভ জানিয়ে অপর ভাইকে দাওয়াত দেই ও সমগ্র উম্মতে মুহাম্মদির জন্য দোয়া করি।

(তিন) ইলম ও যিকিরঃ মাকসূদ ঃ আল্লাহ তায়ালার কখন কি অদেশ-নিষেধ ও হুজুর (সঃ)এর তরীকা জেনে সে অনুযায়ী আমল করা।

লাভ ঃ কোন ব্যক্তি ইলমে দ্বীন হাসিল করার সময় মারা গেলে সে শহীদি মর্তবা লাভ করবে।

এলেমের লাভ ঃ ১। হযরত ওসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্ব শ্রেষ্ঠ যিনি কোরআন শরীফ শিখেছে ও অপরকে শিক্ষা দিয়েছে। (বোখারী) ২। হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন, আমি হজুর (সঃ) হতে শুনেছি যে ব্যাক্তি ইলমে দ্বীন শিক্ষা করার জন্য পথে বাহির হয় আল্লাহ পাক তার জন্য বেহেস্তের রাস্তা সহজ করে দেন আর ফেরেস্তাগন তালেবে ইলমের সম্মানের জন্য পাখা বিছিয়ে দেন। এবং আসমান যমীনের সকল মাখলুক তার জন্য ইস্তেগফার করতে থাকে। (হায়াতে সাহাবা) ৩। এহ্য়া উলুম গ্রন্থে উল্লেখ আছে কোন বান্দা একটি ছুরা পাঠ করতে আরম্ভ করলে ফেরেশতাগন ছুরা শেষ না করা পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকে।

হাসিল করার তরীকা ঃ ইলম আমরা দুই ভাবে শিখি, ফযায়েলে ইলম ও মাসায়েলে ইলম। ফাযায়েলে ইলম আমরা কিতাবের তালিমি হালকা থেকে শিখি আর মাসায়েলে ইলম উলামায়ে কেরামদের থেকে জেনে নিই। ইলমের লাভ জানিয়ে অপর ভাইকে দাওয়াত দেই ও সবার জন্য দোয়া করি।

যিকিরের মাকসুদ ঃ সকল সময় আল্লাহর ধ্যান খেয়াল অন্তরে পয়দা করা।

যিকিরের ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি যিকির করতে করতে জিহ্বাকে তর ও তাজা রাখবে কিয়ামতের দিন সে হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

যিকিরের লাভ ঃ ১। যারা সর্বদা যিকিরে মগ্ন থাকবে তারা হাসতে হাসতে বেহেস্তে প্রবেশ করবে।

২। যিকিরের মজলিশ ফেরেশতাদেরই মজলিশ। ৩। হুজুর (সঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ পাক ফরমান যে, তুমি ফজরের নামাজের পরে ও আসরের নামাজের পরে কিছুক্ষণ আমার যিকির করে নাও আমি মধ্যবর্তী সময়ের জন্য যথেষ্ট হব।

যিকির হাসিল করার তরীকা ঃ শ্রেষ্ঠ যিকির হল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আফযাল যিকির হল কোরআন তেলাওয়াত করা। সকাল বিকাল তিন তাসবিহ আদায় করা। ১০০ বার সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। ১০০ বার আসতাগফিরুল্লা-হাল্লাজি লা-ইলাহা ইল্লাহুয়াল হাইউল কাইউম ওয়া আতুবু ইলাইহি পড়া। ১০০ বার আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদিনিন নাবিয়্যিল উম্মি ওয়ালা আলিহী ওয়াসাল্লিম তাসলিমা।

এই তাসবিহগুলি সকালে তিনশতবার বিকালে তিন শত বার আদায় করি। মাসনূন দোয়াগুলি ঠিক মত আদায় করি ও যিকিরের লাভ জানিয়ে অপর ভাইকে দাওয়াত দেই ও দোয়া করি।

(চার) একরামুল মুসলিমিন

মাকসুদ ঃ প্রত্যেক মুসলমান ভাইয়ের কিম্মত জেনে তার সম্মান করা।

ফযীলত ঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের উপকার করার চেষ্টা করে তবে আল্লাহপাক তাকে দশ বছর এতেকাফ করার ছওয়াব দান করবেন।

একরাম হাসিল করার তারীকা ঃ আমরা আলেমদের তাযিম করি, বড়দের শ্রদ্ধা করি, ছোটদের স্নেহ করি। এর ফযীলত জানিয়ে অপর ভাইকে দাওয়াত দেই।

ইকরামুল মুসলিমীনের ফযীলত ১০ টি ঃ ১। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কারো কোন দ্বীনী বা দুনিয়াবী হাজত বা প্রয়োজন তাকে খুশী করার উদ্দেশ্যে পুরা করবে তবে নিঃসন্দেহ সে আমাকেই খুশী করল। এবং যে ব্যক্তি আমাকে খুশী করল বস্তুতঃ সে আল্লাহ্ তা'আলাকেই খুশী বা সন্তুষ্ট করবে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। ২। এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের একটি হাজত পুরা করবে সে হজ্জ বা ওমরা পালনকারী ব্যক্তির ন্যায় সওয়াব পাবে। ৩। হুজুর আকরাম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজন মিটানোর জন্য অগ্রসর

হবে এবং সাধ্যমত চেষ্টা করবে তার জন্য ইহা দশ বৎসর ইতেকাফের থেকেও উত্তম হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য একদিন ই'তেকাফ করে আল্লাহ্ পাক তার ও জাহান্নামের আগুনের মাঝে ৩টি খন্দক (পরিখা) অন্তরায় করে দিবেন। এদের দুরত্ব আস্মান হতে যমীনের দুরত্বের চাইতেও বেশী। -ত্ববরানী, বায়হাকী ৪। হুজুর (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষক্রটি ঢেকে রাখে, আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াও আখেরাতে তার দোষক্রটি ঢেকে রাখবেন। এবং আল্লাহ্ তা'আলা ঐ পর্যন্ত বান্দাকে সাহায্য করতে থাকবেন, যতক্ষণ সে মুসলমান ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে। (মুসলিম আবূ দাউদ) ৫। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, যে লোক (মাখলুকের) উপর দয়া করে আল্লাহ্ তা'আলাও তাদের উপর দয়া করেন। তোমরা যমীনবাসীদের উপর দয়া কর, তাহলে আসমান বাসী তোমাদের উপর দয়া করবে। -আবূ দাউদ

(পাঁচ) তাসহিয়ে নিয়্যত

মাকসুদ ঃ আমরা যে কোন কাজ করি উহা আল্লাহকে রাজি-খুশী করার জন্য করি।

ফযীলত ঃ নিয়্যতকে সহী করে সামান্য খুরমা দান করলে আল্লাহপাক উহাকে বাড়িয়ে উহুদ পাহাড় পরিমান ছওয়াব কিয়ামতের দিন দান করবেন। আর যদি নিয়্যত সহী না করে পাহাড় পরিমানও দান করি তাহলে খুরমা পরিমান সওয়াবও পাওয়া যাবে না।

তাসহিহে নিয়ত এর লাভ ঃ ১। হযরত মোয়ায (রাঃ) বলেন হুজুর (সঃ) আমাকে যখন ইয়ামন পাঠালেন তখন বিদায় কালে আমি শেষ উপদেশ অনুরোধ জানালে হুজুর (সঃ) প্রত্যেক কাজই এখলাছ ও আন্তরিকতার সহিত সম্পন্ন করতে বলেন! এখলাছের সহিত সামান্যতম আমল ও অনে বড়। ২। যে ব্যক্তি এখালাসের সাথে আল্লাহকে রাজী করার নিয়তে একটি খুরমা দান করেন আল্লাহ পাক তার সওয়াব বাড়িয়ে অহুদ পাহাড় বরাবর করে দেন। (ছাদাকাত) ৩। কোন মুসলিম মাতা তার বাচ্চাকে যদি আল্লাহ্র ও য়াস্তে দুধ পান করায় তাহার প্রতেক ফোটা দুধের বিনিময়ে একটি নেকি তাহার আমল নামায় লেখা হয়। ৪। একটি হাদিসে আছে আল্লাহ তায়ালা আমলসমূহের মৃধ্যে ঐ আমালই কবুল করেন যা একমাত্র আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্যে করা হয়। (তাবলীস) ৫। হাদিসে এসেছে যেই ব্যাক্তি আল্লাহর ভয়ে কেঁদেছে এমন কি তাহার চোখের এক ফোটা পানিও মাটিতে পড়েছে, কেয়ামতে দিন তাহাকে কোন আজাব দেয়া হবে না (ফাঃ জিকির)

(ছয়) দাওয়াতে তাবলীগ

মাকসুদ ঃ আল্লাহর দেওয়া জান-মাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে এর সহীহ্ এস্তেমাল শিক্ষা করা।

ফযীলত ঃ আল্লাহর রাস্তার ধূলা বালু ও জাহান্নামের ধোঁয়া একত্র হবে না। এই কাজ শিক্ষা করার জন্য প্রথমে তিন চিল্লা(চার মাস) সময় আল্লাহর রাস্তায় লাগিয়ে এই কাজ শিক্ষা করতে হয়। প্রথমে চার মাস সময় লাগিয়ে এই কাজ শিক্ষা করি এবং মৃত্যু পর্যন্ত এ কাজ করার নিয়ত করি।

তাবলীগের লাভ ঃ ১। ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে ভাল কথা আর কার হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকে এবং নেক আমল করে এবং বলে যে নিশ্চয় আমি মুসলমানদের মধ্য হতে এক জন। ২। তোমরা সর্ব শ্রেষ্ঠ জাতি। মানুষের মঙ্গলের জন্যই তোমাদিগকে বের করা হয়েছে। তোমাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এই যে তোমরা সৎকাজে আদেশ করে থাক ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান করে থাক এবং আল্লাহর উপর ইমান এনে থাক। ৩। হুজুর (সঃ) বলেছেন, খোদার কছম খেয়ে বলতেছি তোমার হেদায়েত ও উপদেশ দ্বারা যদি এক জন লোকও সৎ পথে আসে তবে তা তোমার জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান করা অপেক্ষাও অধিক শ্রেষ্ট। ৪। আল্লাহ তায়ালার রাস্তার ধূলাবালি আর জাহান্নামের ধোঁয়া ও একত্রিত হবে না। ৫। কেহ আল্লাহ তাআলার রাস্তায় এক টাকা খরচ করে আল্লাহ পাক তাকে সাত লক্ষ টাকা দান করার ছওয়াব দিয়ে থাকেন। ৬। আল্লাহ পাকের রাস্তায় বাহির হয়ে যে কোন আমল করবে আল্লাহ পাক ঐ আমলের সওয়াবকে ৪৯ (উনপঞ্চাশ) কোটি গুন বাড়িয়ে দিয়ে থাকেন। ৭। দাওয়াত ও তাবলিগের জন্য আল্লাহ পাক আরো বলেন, হে নবী আপনি বলে দিন যে এটাই আমার রাস্তা আমি মানুষকে জেনে বুঝে আল্লাহ্র দিকে ডাকি, এটা আমার কাজ এবং যারা আমার অনুসারী হবে উম্মত বলে দাবি করবে এটা তাদেরও কাজ।

মদীনাতে দ্বীনী মেহনতের নক্সা

আমাদের এটা বুঝা দরকার যে, নবী (সা) এবং তাঁর ছাহাবী (রাঃ) গণ দ্বীনের মেহ্নত এক বিশেষ পদ্ধতির উপর করেছিলেন। তাই আমরাও চাই ঠিক একই পদ্ধতিতে তাঁদের মেহনতকে শিখতে। আমাদের উপর আল্লাহপাকের বহুত মেহেরবানী যে, জামাতের সাথীরা কোন কোন জায়গায় আস্তে আস্তে এই মেহনতকে শিখতে শুরু করেছেন। কিন্তু কোন স্থানেই এ মেহনত পূর্ণতায়

পৌঁছেনি, বরঞ্চ একেবারে প্রাথমিক পর্যায়েই আছে। তাই এখন যদি প্রত্যেক এলাকার মেহনতকারী সাথী ভায়েরা এটা মনে করেন যে, তারা যা করছেন তাই পূর্ণ মেহনত, তবে কক্ষনই আসল মেহনত পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবেন না। তাই যে সাথীই এই দ্বীনের মেহনতকে শুরু করবেন, তিনি যেন এটা স্পষ্ট করে বুঝে নেন যে, আমার এই মেহনত একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের; তাই মেহনত করতে করতে ঐ পর্যায়ে পৌঁছতে হবে যা নবী (সাঃ) তাঁর সাথীদের নিয়ে করেছিলেন। তাই ওটাই যখন আসল মেহনত, কাজেই ওর সামনে নিজের এই ক্ষুদ্র মেহনতকে সামনে রেখে দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করা দরকার যে আমাকে মেহনত করতে করতে শেষ পর্যায়ে পৌঁছতে হবে ইনশাআল্লাহ। তবে মেহনত শুরু করার পূর্বে আমাদের চিন্তা করা দরকার যে ঐ মেহনতের লাভ কি? তারপর জানা দরকার কেমন করে এই মেহনত করতে হবে? এই দ্বীনী মেহনতের লাভ এই যে, মেহনতকারী এবং অন্যরা যাদের উপর তা করা হয় সকলেই হেদায়েত পেয়ে যাবেন। মানুষ দ্বীনের উপর ততই চলতে পারবে যতটা আল্লাহপাকের তরফ হতে হেদায়েত আসবে। আর আল্লাহপাকের তরফ হতে হেদায়েত ঐ পরিমাণেই আসবে যতটা মানুষ তাদের মেহনতকে বাড়াতে থাকবে। আর এ মেহনত যখন মুসলমানদের মধ্যে হতে কমতে থাকবে তখন হেদায়েতও তাদের মধ্যে হতে বের হতে শুরু হবে। সর্ব প্রথম হেদায়েত বা সঠিক পদ্ধতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, মানুষের সাথে লেন-দেন এবং মোয়াশারাত বা সামাজিকও আত্মীয়তার সম্পর্ক হতে বের হতে থাকবে। তখন মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন প্রভৃতি কাজ নবী (সাঃআঃ) এর প্রদর্শিত রাস্তা বাদ দিয়ে অন্য ধর্মাবলম্বীদের দেখান পথে সম্পন্ন করতে থাকবে। অতঃপর আস্তে আস্তে মুসলমানদের নিকট হতে ফরয, ওয়াজেব আমল গুলো ছুটতে থাকবে। এমনকি তাদের মধ্যে আস্তে আস্তে বিদ'আত (অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃআঃ) -এর প্রদর্শিত দ্বীনী পদ্ধতি ছেড়ে অন্যভাবে দ্বীনের কাজ করা) প্রবেশ করতে থাকবে। এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা ইসলাম ত্যাগ করতে থাকবে। তারপর আবার যদি দ্বীনের মেহনত শুরু হয় তখন আস্তে আস্তে আল্লাহপাকের তরফ হতে হেদায়েত আসতে শুরু করবে। তার পর যতই মেহনতের স্তর বা কোরবানী বাড়তে থাকবে, ততই হেদায়েত প্রসার লাভ করতে থাকবে। ফলে মানুষ আস্তে আস্তে নামাজী ব'নতে শুরু করবে এবং অন্যান্য এবাদত যেমন রোজা রাখা, জাকাত আদায় করা, হজ্জ করা ইত্যাদি আমল করতে শুরু করবে। তারপর টাকা রোজগার এবং খরচের ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম মত চলতে শুরু করবে। তারপর আল্লাহপাকের তরফ থেকে হেদায়েত আসতে শুরু করবে। আর এই হেদায়েত আসবে দ্বীনের উপর

মেহনতের অনুপাতে। আজকাল আমরা যে বলি, মানুষ দ্বীনের উপর চলছেনা, বরঞ্চ বেদ্বীনী হয়ে যাচ্ছে তার মূল কারণ হল দ্বীনের মেহনত ছুটে গেছে। এতদসত্ত্বেও আল্লাহপাকের বান্দারা যেখানে যতটুকু মেহনত শুরু করছেন সেখানে ততটুকুই আল্লাহপাক হেদায়েত দিতে শরু করছেন। এবং ঐ হেদায়েতের উপর ভিত্তি করেই দ্বীনের উপর মানুষ চলতে শরু করছেন। যেখানে তা'লিমের প্রথা ছিল না সেখানে আস্তে আস্তে তা'লিম চালু হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হেদায়েত এখন পর্যন্ত ঐ স্তরে পৌঁছেনি যার বদৌলতে সাথীরা কামাইয়ের মধ্যে আল্লাহর হুকুম ও নবীর তরীকা পালন করতে পারে এবং খাওয়া দাওয়া, পোশাকের মধ্যে, ঘরবাড়ী বানানো এবং লেনদেনের মধ্যে রাসূল (সাঃআঃ)-এর প্রদর্শিত সুন্নতী রাস্তা অনুসরণ করতে পারে। কিন্তু আমরা সমস্ত মুসলমানই ঐ পর্যায়ের হেদায়েতের মুখাপেক্ষী যাতে আমাদের সমস্ত কাজ কারবার নবী (সা)-এর প্রদর্শিত পথে হয়। তাই আমাদের মনের কামনা ও দোয়া এই যেন মেহনতের মাত্রা বাড়ে যাতে করে আমরা জীবনের সর্বস্তরে দ্বীনের উপর চলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারি। আর আমাদের এই আমলী জীবন দেখে অন্যদের পক্ষেও ইসলামকে বুঝা সহজ হয়ে দাঁড়ায়। এখন এই মেহনত করার দু'টো পদ্ধতি আছে। প্রথমতঃ মেহন্‌তকারীদের সংখ্যা বাড়ান। দ্বিতীয়তঃ মেহনতকারীদের কোরবানী বাড়ান। এ দুটো সম্পূর্ন পৃথক রাস্তা। যদি লক্ষ লক্ষ মেহনতকারীও হয়ে যান কিন্তু তারা যদি অল্প মেহনত করেন, তবে হেদায়েতও একটু একটু আসবে। আর যদি আল্লাহপাক দয়া করে মেহনতকারীদের মধ্যে ত্যাগ তিতিক্ষাও কোরবানী বাড়িয়ে দেন তবে মুসলমানও হেদায়েত পাবে আর সমগ্র মানব জাতিও হেদায়েত পেয়ে যাবে। আজ পর্যন্ত আমাদের মেহনতের পদ্ধতি হল, ব্যস্ত লোকেরা তাদের চাকরি, কারবারের ব্যস্ততার মধ্যে হতে কিছু সময় এমন ভাবে বের করছেন যাতে করে তাদের দুনিয়াবী কোন ক্ষতি না হয়। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত মোহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর ছাহাবী (রাঃ) দের থেকে দ্বীনের জন্য কোরবানী করা তরীকা দেখিয়েছেন। তাই আজকের যামানায় দ্বীনের মেহনতকারীদের মধ্যে যতটা ঐ ধরনের কোনবানী আসবে ততই মেহনতের স্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এখন আমি [মাওলানা ইউসুফ (রঃ) মোহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাথীদের মেহনতের অবস্থাকে বর্ণনা করতে চাই, যার থেকে আমরা বহু দূরে। কিন্তু যদি ঐ মেহনতকে সামনে রেখে চলতে থাকি তবে আল্লাহ চাহেন ত আমাদের এ পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিবেন। তাই প্রতিটি মেহনতকারী দায়ীকে (দ্বীনের পথে আহবানকারীকে) ঐ পরিপূর্ণ মেহনতকে সামনে রেখে ঐ পর্যন্ত পৌঁছায় নিয়ত করতে হবে। আপনারা এটাতো সকলেই জানেন যে, সমস্ত আরব

উপদ্বীপে মদীনাবাসী আনসারদের মেহনতের দ্বারাই দ্বীন প্রসারিত হয়েছিল। রসূল (সাঃ)-এর যামানায় আরবের লোক সংখ্যা হিন্দুস্তানের মত না হলেও আয়তনের দিক দিয়ে তা হতে ছোটও ছিল না। দুনিয়াতে রোজগারের যে নিয়মাবলী চালু আছে বলতে গেলে তার কিছুই সেখানে ছিল না। সারা দেশে এমন কোন সরকারী ব্যবস্থাপনা ছিল না যে, অফিস আদালতে চাকরি করে রুজি রোজগারের সহজ ব্যবস্থা করা যেত। আল্লাহর ঘরে আগত হাজী সাবদের নিকট হতেও কিছুই আদায় করা হত না। বরঞ্চ প্রত্যেকেই তাদের পিছনে খরচ করত। ফলে হজ্জের রাস্তাও তখন রোজগারের পথ ছিল না। ক্ষেত খামার এবং বাগানও খুব কম ছিল। আর ব্যবসা বাণিজ্যও মক্কা মোকাররমা ও আরও দু'একটা স্থান ব্যতীত অন্যত্র ছিল না। কোথাও কোথাও সামান্য পরিমানে খেজুর, ডালিম ও আঙ্গুরের বাগান ছিল। মূল কথা হল, সমগ্র আরব জাতি সাধারণ ভাবে বস্ত্রহীন, অভুক্ত, পিপাসার্ত ছিল। সবার কাছে না কাপড় ছিল, না ছিল থাকার স্থান, আর না ছিল খাদ্য পানীয়। ক্ষুধার তাড়নায় অনেক সময় হারাম পর্যন্ত খেত। যেমনঃ পোকামাকড়, সাপ, রক্ত ইত্যাদি। প্রায় এলাকার লোকেরাই বেকার ও ক্ষুধার্ত ছিল। অন্য দেশের রাজা বাদশাহরা পর্যন্ত আরবদের উপর শাসন চালাতে ইচ্ছা করত না। কারণ শাসন কাজে আকৃষ্ট করার জন্য যে সমস্ত লাভজনক জিনিষ থাকা প্রয়োজন তা তাদের ছিল না, যেমনঃ সোন, পেট্রোল ইত্যাদি। রোম ও পারস্য সম্রাটেরা আরবের সীমান্তে এজন্য সৈন্য মোতায়েন রাখত যাতে করে এই ক্ষুদার্ত পিপাসার্ত আরবেরা তাদের উপর হামলা করে না বসে। যে দেশে রাজা বাদশাহরা পর্যন্ত শাসন করার সাহস পায় না, সেখানে আল্লাহপাক মোহাম্মদ (সাঃ)-এর দ্বীনের মেহনত শুরু করালেন। মদীনা ছাড়া আর যে সমস্ত এলাকা কৃষি ও ব্যবসার কেন্দ্র ছিল সকলেই মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরোধীতা শুরু করল। সমস্ত আরবের চক্ষু ছিল মক্কাবাসীদের উপর। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তবে তারাও করবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় মক্কাবাসীরা নবী (সাঃ)-এর জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত বিরোধীতা করেছে। এ অবস্থায় দাওয়াতের মত আমল হয়েছে তা মদীনা শরীফ হতে হয়েছে। যে কোন স্থানে কেউ ইসলামে প্রবেশ করত তাঁকে সাথে সাথে মদীনাতে ডাকা হত। ফলে মদীনা এমন এক বসতি হয়ে দাঁড়াল যেখানে মুসলমানেরা তাদের ভাই বেরাদার, বাপ-মা, আত্মীয় স্বজন, বাড়ী-ঘর, সহায় সম্পদ ছেড়ে এসে বসবাস করতে শুরু করলেন। তাদের বেশীর ভাগই যখন নিজের এলাকা থেকে হিজরত করতেন সাথে করে কোন ধন-সম্পদ নিয়ে আসতে পারতেন না। মদীনাবাসী আনসারদের উপরই তাদের থাকা খাওয়ার ভার অর্পিত হত। ফলে মদীনা এমন এক বসতি হয়েছিল যেখানে বহিরাগত এবং

স্থানীয়গণ সমান হয়ে উঠেছিল। মোহাজেরদের কেউ কেউ তো ফকিরই ছিলেন, বাকীদের রোজগারের রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাকী কারো কারোর মাল সম্পদ হিজরতের সময় তাদের বংশের লোকেরা ছিনিয়ে নিয়েছিল। মূল কথা হল মোহাজেরগণ মদীনাতে একান্ত নিঃস্ব হয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ঐ সকল নিঃস্ব মোহাজের এবং মদীনার আনসারদের নিয়ে হুযুর (সাঃ) দ্বীনের মেহনত শুরু করলেন। প্রথম অবস্থায় মোহাজেরদের কামাই রোজগারে নিষেধ করা হত না। তবে যতদিন পর্যন্ত তাদের রোজগারের ভাল কোন ব্যবস্থা না হত ততদিন পর্যন্ত আনসাররাই তাদের প্রয়োজন পুরা করতেন। ফলে মদীনাবাসীদের অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌছল যে, কমপক্ষে দশ বৎসর পর্যন্ত তাদের ব্যবসা ও উৎপাদন বৃদ্ধির মেহনত করার প্রয়োজন ছিল। কারণ তাদের উপরই খরচের সম্পূর্ণ ভার অর্পিত হয়েছিল। ফলে কাজ কারবারে আরো অধিক সময় ব্যয় করার প্রয়োজন ছিল যাতে করে অতিরিক্ত সমস্ত খরচ সংকুলানের উত্তম ব্যবস্থা হয়। ফলে তখন বাহ্যিক দৃষ্টিতে বাইরে বের হয়ে কোন সফরে বা জেহাদে যাওয়ার কোনরূপ সুযোগই ছিল না। কিন্তু এতদসত্বেও নবী (সাঃ) মদীনাবাসীদের রোজগারের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার পরিবর্তে এই দশ বৎসর তাঁদের নিয়ে নিজের পুরা মেহনত করলেন। এবং দ্বীনের মেহনতের এমন এক নকসা কায়েম করলেন যে, মানব জীবনের যে প্রয়োজন পারিবারিক প্রয়োজন যার মধ্যে আছে বিবি, ছেলে মেয়েদের প্রতিপালন এবং কামাই রোজগার তা থেকে বারবার ছুটিয়ে দ্বীনের মেহনতের কাজকে প্রাধান্য দিয়ে ছিলেন। তাঁদেরকে এমন ভাবে অভ্যস্ত করে তুলেছিল যে যখনই তাঁদেরকে আল্লাহপাকের রাস্তায় বের হতে বলা হত এবং যত জনকে বলা হত, এবং যে স্থানের জন্য বলা হত, যখনই বলা হত তখনই সমস্ত ব্যস্ততা ছেড়ে বের হয়ে পড়তেন। এমনকি যাকে মাগরেবের সময় জেহাদে বের হতে বলা হত তাঁকে ঐ রাত আর মদীনাতে থাকতে দেয়া হত না। যেমন পাক্কা নামাজী আজানের ধ্বনি শুনলে সমস্ত ব্যস্ততা ছেড়ে দিয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে পড়ে, তেমনিভাবে মদীনাবাসীরা আল্লাহপাকের রাস্তায় বের হওয়ার নামে সবকিছু ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। তাই যখনই আল্লাহর রাস্তায় (ঈমান ও দ্বীনের প্রয়োজনে) বের হবার আহবান শোনা যেত যদিও তা জিনিস পত্র বেচা কেনার সময় বা দোকান খোলার সময় বা ক্রয় বিক্রয়ের ভীষণ ব্যস্ততার সময় অথবা খেজুর কাটার সময় বা বিবাহ বাসরে বা কনে বিদায় দেয়ার সময় বা মহিলাদের বাচ্চা প্রসবের সময় বা অসুস্থতার সময় ডাক আসত, তখনই তারা সমস্ত ব্যস্ততা ছেড়ে হাতের কাছে যে রসদ ও সামানা থাকত তা নিয়েই বের হয়ে পড়তেন। এভাবেই ছাহাবারা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে যে স্থানে প্রয়োজন, যত

সময়ের জন্য প্রয়োজন সহজেই বের হয়ে যেতেন আল্লাহপাকের রাস্তায়। এবং ঐ সফর সমূহে জান ও মালের কষ্ট সহ্য করার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল তাদের।

নবী (সাঃ) মদীনা মনোয়ারার দশ বৎসরের জীবনে প্রায় দেড়-শতটি জামাত বের করেছিলেন। যার মধ্যে পঁচিশটি সফরে তিনি নিজে ছাহাবী (রাঃ) দের সাথে ছিলেন। কোন সফরে দশ হাজার জন বের হয়েছিলেন (মক্কা বিজয়ে), কোনটিতে পঞ্চাশ জন, হাজার জন, কোনটিতে তিনশত তেরজন (বদর যুদ্ধে), কোনটিতে দশজন, কোনটিতে পনের জন, কোনটিতে আটজন, কোনটিতে সাত জন বের হয়েছিলেন। সময়ের হিসেবে কোনটিতে দু'মাস, কখনও তিন মাস, কখনও বিশ দিন, কখনও পনের দিন লেগেছিল। বাকী একশত পঁচিশটি জামাত বের হয়েছিল তার মধ্যে কোন সফরে ছিলেন হাজার জন, কোনটিতে পাঁচশত জন, কোনটিতে ছয়'শ জন এবং এছাড়া কম ও বেশী সংখ্যায় বের হয়েছিলেন।

সময়ের হিসেবে কোনটাতে ছ'মাস, কোনটাতে চার মাস এবং কম বেশী সব রকমের সময়ই লেগেছিল। তাই এখন হিসাব করতে হবে প্রত্যেক সাহাবী (রাঃ) এর ভাগে বাইরে বের হওয়াতে গড়ে কত সময় লেগেছিল। এবং প্রত্যেক বৎসরে কতগুলো সফর করেছিলেন। যদি সমস্ত সফরকে একত্র করে গড় করা যায় তবে দেখা যায় প্রায় প্রত্যেক সাহাবী (রাঃ) বৎসরে ৬/৭ মাস বাইরে আল্লাহপাকের রাস্তায় কাটিয়ে ছিলেন। তারপর এই মেহনতের ফলশ্রুতি স্বরূপ বিভিন্ন স্থানের নুতন মুসলমানদের ডেকে বলা হত, 'মদীনাতে এসে দ্বীন শিক্ষা কর'। কারণ ইসলামী জীবন শিখতে হলে ইসলামী পরিবেশের প্রয়োজন। আর এই পরিবেশে একমাত্র মদীনা শরীফেই বিরাজ মান ছিল। তাই মদীনার আনসারদের ভাগেই পড়েছিল এই নতুন মুসলমানদের তা'লীম বা শিক্ষা দেয়ার গুরুভার। ফলে মদীনাতে অবস্থান কালে তাঁদেরকে মসজিদের আমল (এলেম শিক্ষা ও শেখান, নামাজ, জিকির, খেদমত)-এর জন্য সময় বের করতে হত-যাতে করে মসজিদে শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা দেয়ার পদ্ধতি এবং নব্য মুসলমানদের উত্তম তরবিয়ত দেয়া চালু থাকে। ফলে মদীনাবাসীরা তাঁদের জীবনের পদ্ধতিকে এমন বানিয়ে নিয়ে ছিলেন যে, যদি দুজনে মিলে একত্রে কারবার বা কৃষি কাজ করতেন তবে পালাক্রমে মসজিদের আমলেও ব্যবসায় নিযুক্ত হতেন। একজন দিনে আসলে অন্যজন রাতে আসতেন। এশার পর কেউ এবাদতে মশগুল হতেন, অন্যজন বাড়িতে বিশ্রাম নিতেন এবং শেষ রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। ফলে এভাবে পালাক্রমে চব্বিশ ঘন্টাই স্থানীয় লোকেরা মসজিদে উপস্থিত থাকতেন। যখনই বাইরে হতে কেউ আসতেন, তখনই তাঁদের সামলাতে মসজিদে কেউ না কেউ উপস্থিত থাকতেনই। তাঁরা

বহিরাগতদেরকে নামাজের সময় নামাজে, জিকিরের সময় জিকিরে, তা'লিমের সময় তালিমে সামিল করাতেন। ফলে বহিরাগতরা কক্ষণও নিজেদেরকে অবসর মনে করতেন না। তাই এখন হিসাব কর ছয় সাত মাসতো বাইরের সফরে খরচ হত এবং মসজিদের আমলে দুই আড়াই মাস। তবে দুনিয়ার কাম কাজের জন্য কতটুকু সময় বাকী থাকল। এভাবে প্রত্যেক-সাহাবী (রাঃ)-এর বাইরের নকল হরকতে (সফরে) বহুত সময় লেগে যেত এবং নব মুসলমানদের তা'লীম ও তরবিয়ত দিতেও বহুত সময় চলে যেত। একদিকে আমদানী ও রোজগার সাধারণ অবস্থা থেকে অনেক কমে গেল, অন্য দিকে খরচ আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেল। বাইরের সফরের খরচ নিজের সংসারের খরচ, বহিরাগতদের মেহমানদারীর খরচ, মদীনা বাসী গরীবরা যখন সফরে বের হতেন তাদের খরচ, যানবাহন, খানা পিনার খরচ, বাহির হতে অবস্থাশালীরা মদীনা শরীফ আগমন করলে তাদের দাওয়াত করে খাওয়ানোর খরচ, দুর্ভিক্ষ কবলিত এলাকার লোকদের সাহায্য করার খরচ। মূল কথা হল সফরেরও মদীনায় অবস্থানকালীন সময়ের খরচ বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু রোজগারের রাস্তা ক্রমান্বয়ে কম হচ্ছিল। ফলে শেষ পর্যায়ে এ অবস্থা হল যে বাইরে এবং ঘরে অনাহারের কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছিল। শীত ও গ্রীষ্মের কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছিল। ফলে শেষ পর্যায়ে এ অবস্থা হল যে বাইরে এবং ঘরে অনাহারের কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছিল। শীত ও গ্রীষ্মের কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছিল। ফলে নিজেদের জীবনের উপর কষ্ট উঠিয়ে ভিতরের ও বাহিরের মেহ্নতকে চালাতে হচ্ছিল।

তার ফল এই হয়েছিল যে ঈমানের মেহ্নতকারী যখন ঈমানের প্রয়োজনকে নিজেদের রোজগার ও সংসারের প্রয়োজনের উপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন তখন আল্লাহ পাক খুশী হয়ে সমস্ত আরবের অধিবাসী কওম, গোত্র ও কবিলাকে ইসলামে প্রবেশ করিয়েছিলেন। এবং মোহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর স্যাহাবী (রাঃ) গণের কোরবানীর বদৌলতে ঐ সমস্ত লোকদেরও চরিত্রের পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন যাদের চরিত্রের সংশোধনের সাহস রাজা, বাদশাহ বা কোন শাসকরা পর্যন্ত করেননি। তারপর রাসূল (সাঃ) এমন এক সময় দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন যখন সমস্ত আরববাসী ইসলামের আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে গিয়েছিলেন এবং মদীনার প্রতিটি ঘর সম্পদ হতে শূন্য হয়ে গিয়েছিল।

দাওয়াতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

আল্লাহপাক এরশাদ করেন, আপনার পূর্বে যত নবীই পাঠিয়েছি তাদের এই বলতে বলেছি যে, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নাই; অতএব আমারই এবাদত কর। (সূরা আম্বিয়া-২৫)।

তারপর হাদীস শরীফেও দেখা যায় নবী (সাঃ) যখন মায়াজ (রাঃ) কে ইয়েমেনে দাওয়াত দিতে পাঠান তাকে প্রথম কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ -এর দাওয়াত দিতে বলেন। নবী (সাঃ) এর প্রদর্শিত রাস্তাও তাঁর জীবনীতে রয়েছে দাওয়াতের উত্তম নিদর্শন এবং পরিপূর্ণ নকশা।

তিনি ১৩ বৎসর মক্কা শরীফে মানুষদের দাওয়াত দেন শুধুমাত্র তৌহিদের দিকে এবং নিষেধ করেন শেরেক করতে, অন্যান্য ফরজ, ওয়াজেব ও মুস্তাহাবের হুকুম দেয়ার পূর্বে। যেমনঃ নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত এবং সুদ-ঘুষ, যেনা, চুরি করা, হত্যা করা এই জাতীয় অন্যায় কাজ করা হতে নিষেধ করার পূর্বে।

দ্বায়ী যখন দাওয়াত দিতে যাবে তখন তার উপর যে কষ্ট মুসিবত আসবে মানুষের তরফ হতে এবং সাথে সাথে আল্লাহর তরফ হতে যে পরীক্ষা আসবে তাকে তা ছবর করতে হবে। কারণ দাওয়াতের রাস্তা ফুলের পাঁপড়ি বিছান নয় বরং নানা রকম কষ্ট বিপদ দ্বারা পরিপূর্ণ।

এই সম্বন্ধে আল্লাহ্‌পাক বলেনঃ "নিশ্চয়ই আপনার পূর্বে যে রসূল (আঃ) গণ এসেছিলেন তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল, কিন্তু তারা ঐ সমস্ত মিথ্যা কথার উপর ধৈর্য ধারণ করেন এবং আল্লাহর সাহায্য না আসা পর্যন্ত কষ্টই পেতে থাকেন(আনআমঃ ৩৪)

দ্বায়ীকে সর্বদা উত্তম চরিত্রে ভূষিত হতে হবে এবং হেকমতের সাথে দাওয়াত দিতে হবে। যেমনঃ আল্লাহ্‌পাক মুসা ও হারুন (আঃ) কে বলেছিলেন যখন তাঁরা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় কাফেরের কাছে দাওয়াত দিতে গিয়েছিলেন।

আমাদের নবী (সাঃ)-এর প্রশংসা করে আল্লাহ বলেনঃ "আল্লাহপাকের রহমতে আপনি তাদের প্রতি পরম দয়ালু হয়েছেন। যদি আপনি কঠিন স্বভাব এবং কর্ষভাষী হতেন তবে তারা আপনার কাছ হতে দূরে সরে যেত। (আল-এমরান ঃ১৫৯।

অন্যত্র আল্লাহপাক বলেনঃ "হে নবী আপনি আপনার রবের রাস্তার দিকে দাওয়াত দিন হেকমত এবং উত্তমভাবে ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে তর্ক করেন উত্তম ভাবে। (হামিম সেজদাহ-৩৩)

দ্বায়ী খুব বেশী আশাবাদী হবে এবং তার দাওয়াতের তাছির বা প্রভাব অথবা লোকদের হেদায়েতের ব্যাপারে কখনও নিরাশ হবে না। অথবা আল্লাহপাকের সাহায্যে জয় ইত্যাদির ব্যাপারেও বিন্দু মাত্রও ধৈর্য হারা হবে না যত সময়ই লাগুক না কেন। নুহ (আঃ) তাঁর কওমকে ৯৫০বৎসর পর্যন্ত দাওয়াত দিয়েছিলেন ধৈর্য হারা না হয়ে।

সমাপ্ত